আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থ-মালার অষ্টাশীতিতম-গ্রন্থ

সুরের মায়া

সংস্কৃতি সংসদকে
(টালা)
শ্রীমতী [illegible]
কর্তৃক উপহার প্রদত্ত
তারিখ— ২২/১২/৫৪

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩০

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সংস্কৃতি সংসদ
টালা
পাঠাগার ও ...
১৪সি, ... কুমার
ব্যানার্জি লেন
কলিকাতা - ২
তারিখ—22/5/58
সংখ্যা—

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

B14985

সুরের মায়া

হেমন্তের স্বল্পাবসান বেলা ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রক্তিম আভা তখন পশ্চিম আকাশের মেঘলোকে ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র বর্ণ ও শোভার সৃষ্টি করিতেছিল, এবং এই আসন্ন সন্ধ্যার রঙিন্ আলো ও ধূসর ছায়ার মধ্যে নগরের রাজপথ বাংলা কাগজের ফেরিওয়ালার সুতীব্র চীৎকারে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। কখনও বা দ্রুতগামী ট্রাম বা মোটরের শব্দ কুলায়-প্রত্যাগত অসংখ্য কাকের কোলাহলের সঙ্গে মিশিয়া একটা মিশ্রিত কলরবের সৃষ্টি করিতেছিল।

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের একটি অট্টালিকার বাহিরের ঘরে বসিয়া দুইজন ব্যক্তি কোন গভীর বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন।

প্রথম ব্যক্তি একজন এটর্নী, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হইতে পারে; বয়সোচিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আকৃতি,—নাম, প্রমথনাথ মিত্র।

দ্বিতীয় ব্যক্তি যুবাপুরুষ, সুশ্রী, সুন্দর চেহারা; বয়স ত্রিশের মধ্যে; বুদ্ধি ও প্রতিভায়:মুখশ্রী সমুজ্জ্বল, ব্যবসায়ে ডিটেকটিভ্—নাম, বিনয়কুমার ঘোষ।

প্রথম ব্যক্তির কথার উত্তরে তিনি বলিলেন—আমাকে এজন্য আপনার বেশি কিছু বলতে হবে না। প্রথমতঃ আমার কর্ত্তব্য কাজই এই। তা ছাড়া আমার নিজের এ রকম কাজে বড় আনন্দ। যে ঘটনা যতই দুর্ব্বোধ্য ও রহস্য-পূর্ণ, তার তথ্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা শুধু যে আমি কর্ত্তব্য বোধেই করি তা নয়,—নিজের সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করি। আপনি যে কাজের ভার আমায় দিতে চাইছেন, তার সাফল্য সম্বন্ধে অবশ্য এখন কোন কথা বলা যায় না; তবে চেষ্টার কোন ত্রুটী হবে না জানবেন।

প্রমথবাবু বলিলেন, আমার কাছে আপনার এই প্রতিশ্রুতিটুকুই যথেষ্ট। আপনি অল্প দিন এ বিভাগে কাজ করে, যে সব জটিল বিষয়ের তদন্তে অনায়াসে কৃত-কার্য্য হয়েছেন, তাতে আমার আশা আছে, আমার এ কাজ আপনার হাতে কখনও বিফল হবে না। তা হলে ঘটনাটা এখন আপনার ভাল করে জানা দরকার। নলডাঙ্গার বিখ্যাত জমীদার কৃপানাথ বসুর পরিবারের কোন বিশেষ

কাজের ভার আমি আপনাকে দিতে এসেছি। তিনি আমার বাল্যবন্ধু ও মক্কেল। আজ তিনি মৃত,—তাই তাঁর সকল কাজের ভারই আমাকে নিতে হয়েছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। বেহারা আসিয়া ঘরের বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল।

প্রমথ বাবু কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

কৃপানাথ বাবু এদিকে লোক হিসাবে মন্দ লোক ছিলেন না। তিনি বেশ শিক্ষিত, বিদ্যানুরাগী, সহৃদয় জমীদার ছিলেন। তাঁর জমীদারীর ভিতর কোথাও প্রজার উপর অন্যায় অত্যাচার হতে পারত না। তিনি নিজে সমস্ত কাজ-কর্ম্ম দেখতেন, অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা কেউ তাঁর কাছে এতটুকু ফাঁকি দেবার সুবিধা পেত না। সবই ছিল ভাল, কেবল একমাত্র তাঁর অতিমাত্রায় রাগী ও উদ্ধত স্বভাবের দোষে সবই নষ্ট হয়ে গেল। তাঁর কথা বা কাজের প্রতিবাদ তিনি কিছুতে সহ্য করতে পারতেন না। একবার যে কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোবে, অধীনস্থ লোকদের পক্ষে সে একেবারে অলঙ্ঘ্য আইনস্বরূপ, তার আর এতটুকু নড়চড় হবে না। তাতে যার যতই অসুবিধা হোক্। এতদিন সকলেই মাথা হেঁট করে তাঁর শাসন

মেনে চলছিল, তাই কোন গোল হয় নি। শেষে বিরোধ ঘটল, তাঁরই একমাত্র ছেলে নীরেনের সঙ্গে।

নীরেন তখন প্রেসিডেন্সীতে বি-এ পড়ছে। কোন দরিদ্র বিধবার সুন্দরী মেয়েকে সে ভালবেসেছিল। ধরতে গেলে, এ বিবাহে কোন দিক থেকে বাধা ছিল না। কিন্তু নীরেন নিজের মতে কোথাকার একটা অঘরের মেয়ে ঘরে আনিতে চায়,—এ কথা শুনে কৃপানাথ ত একেবারে আগুনের মত জ্বলে উঠলেন। বিবাহে মত ত দিলেনই না, তা ছাড়া, নীরেনকে অত্যন্ত ধমক দিয়ে সাবধান করে দিলেন যে, যদি সে কোন দিন তাঁর অমতে কোন কাজ করে, তা হলে ভবিষ্যতে তিনি আর তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবেন না।

নীরেন কলকাতায় ফিরে এল। তার মেজাজটা ছিল ঠিক বাপেরই মত একগুঁয়ে,—সে কিছুতেই এ বিচার মাথা পেতে নিতে পারলে না।

কিছু দিন পরে সে কৃপানাথকে পত্র লিখে জানালে যে, সে তাঁর কথা মত কাজ করতে পারে নি। কারণ, এটা তার কাছে অত্যন্ত অন্যায় ও অবিচার বলে মনে হয়। সে সেই মেয়েটিকে বিবাহ করেছে। তার বিশ্বাস, সে কিছুই অন্যায় কাজ করে নি। তবু যদি তিনি তাকে

দোষী মনে করেন, তাতে অবশ্য তার আর কিছু বলবার নেই।

কৃপানাথ এই পত্র পেয়ে নীরেনের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছিন্ন করলেন। তিনি তাঁর সম্পত্তির এক নতুন উইল প্রস্তুত করলেন। সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দেশের হিতকর বিশেষ বিশেষ কাজে ভাগ করে দেওয়া হোল; অপর অর্দ্ধাংশ তাঁর অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আশ্রিত অনুগত সকলকে বণ্টন করে দেবার ব্যবস্থা রইল। তাঁর দান থেকে অতি সামান্য ভৃত্যবর্গ পর্য্যন্ত বঞ্চিত হয় নি। কেবল নীরেনের জন্য তাঁর অতুল বিষয়ের এক কপর্দ্দকও থাক্‌ল না।

তাকে এভাবে বঞ্চিত হতে দেখে আমি অনেক আপত্তি করলুম্, অনেক অনুরোধ করলুম্; কিন্তু কোনও ফল হল না। নীরেনের জননী অনেক দিন আগেই গত হয়েছিলেন, কাজেই তার জন্য কষ্ট পাবার মত কেউ ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে তার কথা লোকের মন থেকে সরে গেল।

কেবল আমি মাঝে মাঝে তাঁকে নীরেনের খবর জিজ্ঞাসা করতুম; কিন্তু কখনও তার কথা কিছু শুনতে পাই নি। তার কথা তুল্‌লেই কৃপানাথ বল্‌তেন, সে আমার পক্ষে মৃত, তোমরা কেউ তার কথা আমার কাছে তুলো না।

প্রায় বিশ বছর পরে—মাসখানেক আগে, কৃপানাথের এক চিঠি পেয়ে, আমি নলডাঙ্গায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তখন তিনি রোগশয্যায়। যদিও বাইরে তাঁকে কেউ একটু বিচলিত হতে কখন দেখে নি, তবু আমার মনে হয়, এই আন্তরিক বিপ্লবে তাঁর ভিতরটা একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল।

তাঁকে দেখে আমার মনে হল, আর বুঝি তিনি এ রোগশয্যা থেকে উঠ্‌তে পার্‌বেন না।

আমি তাই দু' একটা কথার পরই বল্লুম, দাদা, এখনো কি নীরেনকে ডাক্‌বার সময় হয় নি ?

আমি দেখলুম, আজ আর তিনি এ কথায় আগের মত রেগে উঠ্‌লেন না,—তাঁর উদ্ধত কণ্ঠস্বর এ কথায় যেন সেদিন কোমল ও মৃদু হয়ে এল। তিনি বল্লেন—সেই কথা বোলবো বলেই তোমায় আজ ডেকে পাঠিয়েছি। অনেক কথাই তোমায় আমার বলে যাবার আছে।

তখন তাঁর কাছে ক্রমে ক্রমে অনেক কথাই আমি শুন্‌লুম্। যা কখন স্বপ্নেও মনে আনিতে পারি নি, অবশেষে তাও শুন্‌তে হল।

নীরেন আর এ পৃথিবীতে নেই, চৌদ্দ বছর আগে সে অশেষ কষ্ট সহ্য করে চলে গেছে। তার বিবাহিত জীবন

সুখের হয় নি,—অভাব ও দারিদ্র্য তাদের সব আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছিল। সংসার প্রতিপালনের জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। তার চিরদিনের অনভ্যস্ত সুখী শরীর সে কষ্ট সহ্য করতে পারে নি। কিছুদিনের মধ্যেই সে অসুস্থ হয়ে নানা কষ্টের মধ্যে মারা যায়।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে সে কৃপানাথকে একখানা পত্র লিখে জানায়, যে, সে তার কৃত কার্য্যের জন্য যে নিগ্রহ ভোগ করে আজ মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছে, তার জন্য সে এখনো অনুতপ্ত নয়। তার বিশ্বাস, সে কোন অন্যায় কাজ করে নি। তবে তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে দুটিকে দেখবার জন্য তাঁকে সে অনুরোধ করে যাচ্ছে। কারণ, তারা নির্দ্দোষ,—তারা ত কোন অপরাধ করে নি। তা ছাড়া, তারা সংসারে একবারে অসহায়; নীরেনের দোষের জন্য যেন তিনি তাদের প্রতি অবিচার না করেন। তিনি তাদের আশ্রয় দেবেন, এ আশ্বাস পেলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারে।

কৃপানাথ বল্লেন—তিনি এ চিঠির কোন উত্তর দেন নি। এক হপ্তা পরে নীরেনের স্ত্রী তাঁকে তার মৃত্যু সংবাদ জানায়। তার পর থেকে তিনি তাদের কোনও সংবাদ জানেন না। তারা বেঁচে আছে, কি মরে গেছে, তারও তিনি এত দিন কোন খবর রাখেন নি।

আমি এ সব কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম। নীরেন নেই! নিতান্ত তরুণ বয়সে, নানা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে, সংসার থেকে চির বিদায় নিয়ে সে চলে গেছে! ছোটবেলা থেকে তাকে আমি বড় ভালবাস্‌তুম্‌,—তার এই শোচনীয় পরিণাম আমার বুকে বড় বেশী করেই বাজ্‌তে লাগ্‌ল। কৃপানাথ যাই বলুন, আমার মনে আশা ছিল, যে, একদিন না একদিন আমি নিশ্চয় নীরেনের সঙ্গে তাঁর মিলন করিয়ে দিতে পারব। সেই জন্য আমি নিজে গোপনে তার কত সন্ধান করেছি! আজ আমার সে সব আশাই শেষ হল!

আমি আর কৃপানাথের মুখের দিকে চাইতে পার্‌লুম্‌ না। এই নিষ্ঠুর দাম্ভিক বৃদ্ধ নিজের জেদ বজায় রাখ্‌তে গিয়ে তাকে কি যন্ত্রণাই দিয়েছে। মৃত্যুকালে তার অসহায় পরিবারদের কথা ভেবে কি কষ্টেই তার প্রাণ গিয়েছিল।

আমায় নিস্তব্ধ থাকতে দেখে কৃপানাথ বল্লেন, ভাই প্রমথ! তুমি হয় ত আমার উপর সাংঘাতিক রকম রাগ কর্‌ছ; কিন্তু এখন আর আমার উপর রাগ করে কোন ফল নেই। আমি এখন যাত্রা করেই বসে আছি—কিন্তু আমার সব কথা এখনও বলা হয় নি।

তার মৃত্যু সংবাদ আমি অবিচলিত ভাবেই গ্রহণ

করেছিলুম। কেনই বা না কোরবো? সে কি কোন দিন আমায় এতটুকু শ্রদ্ধা ভক্তি করেছিল? যদি আমার প্রতি তার সামান্য ভালবাসাও থাক্‌ত, তা হলে কি সে এত সহজে আমার সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছাড়তে পার্‌ত? তুমি জান, তাকে কত যত্নে, কত আদরে মানুষ করেছিলুম। মুখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ; কিন্তু আমার কাজে বা ব্যবহারে কখনো কি কোন ত্রুটী হয়েছিল? আমার একমাত্র সন্তান—যে আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ স্বরূপ ছিল, তার কাছে কি আমি এতটুকু বাধ্যতা কি ভালবাসা আশা কর্‌তে পারি নি? তার বাপের চেয়ে কোথাকার একটা ভিখারীর মেয়েই তার কাছে বড় হল! নিজের একটা সামান্য খেয়ালের জন্য আমাকে অপমান করতে সে একটুও কুণ্ঠিত হল না। এর পর আর তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে? সেও এ কাজের যা ফল, তা জেনে-শুনেই করেছিল।

তার মৃত্যুসংবাদ দেবার পর তার স্ত্রী আমাকে পরে পরে আরো দুখানা চিঠি দিয়েছিল। শেষ পত্রে সে লিখে-ছিল, ছেলেটি মারা গেছে, সে নিজেও মৃত্যুশয্যায়, অতএব মেয়েটিকে যেন আমি নিয়ে আসি।

আমি অবশ্য তাদের খবরও নিই নি, বা কোন কিছু

ব্যবস্থাও করি নি। আমার নিজের সন্তানই যখন রইল না, তখন তাদের সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ? সত্য বল্‌তে কি, তাদের উপর তখন বিজাতীয় ঘৃণা ছাড়া আমার মনে আর কিছু আস্‌ত না। তারা বাঁচুক বা মরুক্‌, উচ্ছন্ন যাক্‌, তাতে আমার কোন লাভ ক্ষতি ছিল না। আমার পুত্রের এমন শোচনীয় অকাল-মৃত্যুর জন্য কি তারাই দায়ী নয়? কার জন্য আমার একমাত্র আশা-ভরসার স্থল—আমার একান্ত বাধ্য সুবোধ ছেলে পর হয়ে গেল?

এই পর্য্যন্ত বলে কৃপানাথ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ একসঙ্গে কথা বলে হয় ত তাঁর কষ্ট হচ্ছিল, হয় ত এই কষ্টকর আলোচনায় পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়ে তাঁকে বেদনা দিচ্ছিল,—তিনি বালিশের উপর মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌লেন।

কতক্ষণ পরে আমি অন্য প্রসঙ্গ পাড়বার জন্য বল্লুম;—তুমি কি জন্য আমায় ডেকেছিলে, তা ত কিছু বল্লে না? কি কাজ আছে বল্‌ছিলে যে?

কৃপানাথ মুখ তুলে বল্লেন—এইবার সেই কথাই বল্‌ছি। ভেবেছিলুম, যে আমার অবাধ্য হয়ে আমায় ত্যাগ করে গেছে, তার বা তার পরিবারবর্গের কারো সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ রাখব না। এতকাল ঠিক সেই

ভাবেই চলে আস্‌ছিলুম। কিন্তু এবার এই অসুখে পড়ে পর্য্যন্ত কেবল তাদেরই কথা বারবার মনে পড়ছে—যাদের আমি আমার মনের স্মৃতি থেকে পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে চল্‌বার চেষ্টা করেছি। এখন খালি মনে হচ্ছে, হয় ত এতটা কঠোর না হলেই ভাল হত। কার কথা বল্‌ছি, বুঝেছ ত?

আমি বল্লুম, নীরেনের স্ত্রী আর মেয়ের কথা বল্‌ছ ত?

তিনি বল্লেন—খালি মেয়েটার কথাই বল্‌ছি। সে ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। তাই এই কয়দিন কেবলি মনে ভাবৃছি, সে সময় যদি তাকে নিয়ে আস্‌তুম! তা হলে ভাল হত। তার মা মারা গেলে, তার যে আর দাঁড়াবার জায়গা নেই, এ কথা তখন বুঝলুম না কেন? কিন্তু এখন যে অনেক দেরি হয়ে গেছে! আমার ত জীবনের সে ভুল শুধ্‌রে নেবার আর সময় নেই! তাই তোমায় ডেকেছি—তার সন্ধান করে তাকে যদি পাও, এই সব বিষয় তুমি তাকে বুঝিয়ে দেবে। আর যদি একান্ত না পাওয়া যায়, তা হলে পূর্ব্বের উইল অনুসারে কাজ হবে। কিন্তু কোন দক্ষ লোকের দ্বারা ভাল করে তার খোঁজ তুমি করবে,—এই ভারটি আমি তোমায় দিয়ে যেতে চাই। যদি তাকে খুঁজে পাও, তখন তুমিই তার অভিভাবক হবে, তখন তার সম্বন্ধে যে রকম ব্যবস্থা করা দরকার, তা তুমিই

কর্‌বে। তোমার কাছে আমার এই শেষ অনুরোধ। এই ভারটি তুমি নিলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মর্‌তে পারি।

আমি বল্লুম, সেজন্য তুমি ভেবো না। তুমি যে ভাবে কাজ কর্‌তে বল্লে, তাই হবে। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব। কিন্তু একটা কথা এই যে, তাকে চেনা যাবে কি করে? সেই যে নীরেনের মেয়ে, এটা প্রমাণ হওয়া চাই ত?

কৃপানাথ বালিশের নীচে থেকে এক তাড়া চিঠি ও একখানা ছবি আমায় দিলেন। বল্লেন—এই থেকেই প্রমাণ হবে।

আজ পনের দিন হল, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমি আপনার সুনাম শুনে সেই নিরুদ্দিষ্ট মেয়েটির সন্ধানের ভার আপনাকে দিতে এসেছি। মেয়েটি আমাদের অপরিচিত, তবে নীরেনের স্ত্রী কৃপানাথকে লিখেছিল, মায়া ঠিক তার মায়ের মতই দেখতে হয়েছে। সে তার একখানা ছবিও সেই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছিল। এই ছবির সাদৃশ্যে হয় ত তাকে চেনা যেতে পারে।

প্রমথবাবু ফটোগ্রাফখানি বিনয়কুমারের হাতে দিলেন।

একটী সুন্দরী তরুণীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী প্রতিকৃতি!

হাস্যদীপ্ত সতেজ উজ্জ্বল চক্ষু! মুখের ভাবে বা দৃষ্টিতে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠার লেশমাত্র নাই!

বিনয়কুমার অনেকক্ষণ ছবিখানি মনোযোগ দিয়া দেখিয়া বলিলেন—মেয়েটি যদি মায়ের মত দেখতে হয়ে থাকে, তা হলে সে চমৎকার সুন্দরী হয়েছে, বলতে হবে!

প্রমথ বাবু বলিলেন, আর এই চিঠিগুলিও আপনি রাখুন। নীরেনের স্ত্রী এগুলো কাশী থেকে কৃপানাথকে লিখেছিল। এ ছাড়া মায়ার সম্বন্ধে আর কোন সন্ধান আমি আপনাকে দিতে পারব না। খরচ-পত্রের জন্য কিছু ভাববেন না। এ কাজটি ভাল ভাবে করবার জন্য যা কিছু দরকার, তার যেন কিছু ত্রুটী না হয়। বেশী আর কি বলব আপনাকে,—কৃপানাথের অন্তিম অনুরোধ বলেও বটে, আর আমার নিজের মনের দিক থেকেও এর জন্য বিশেষ তাগিদ রয়েছে—

বিনয়কুমার বলিলেন—আপনি কিছু ভাববেন না। আমি যতদূর সাধ্য—চেষ্টা করে এর সন্ধান বের করবো। আমার হাতের কাজের ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে যত শীঘ্র পারি—আমি কাশী চলে যাব, স্থির করেছি। পরে যেমন যেমন হবে, আপনি সেইমত খবর পাবেন।

প্রমথবাবু চিঠির তাড়াটা টেবিলের উপর রাখিয়া

বলিলেন—তা হলে এই কথাই স্থির রইল। আপনার আর বৃথা সময় নষ্ট করাব না। এখন তবে আমি উঠি। আমি নিজেও মাঝে মাঝে এসে আপনার কাছে খবর নিয়ে যাব। যখন যা দরকার হবে, তখনি আমাকে জানাবেন।

২

অকস্মাৎ ঘরের দরজা ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলিয়া গেল। একজন লোক অত্যন্ত ব্যস্ত ও চঞ্চলভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল!

লোকটির মুখ ভয় ও উদ্বেগে মলিন ও বিবর্ণ,—অত্যন্ত ছুটিয়া আসার জন্য সে তখন হাঁপাইতেছিল।

একটু দম লইয়া সে কোন দিকে না চাহিয়াই দ্রুতস্বরে বলিল, বিনয়বাবু কার নাম মশায়? বিনয়বাবু এখানে আছেন কি? বিশেষ দরকারে আমি তাঁর কাছে এসেছি!

বিনয়কুমার অগ্রসর হইয়া তাহাকে বলিলেন, আমার নাম বিনয়কুমার—তোমার কি দরকার আছে, আমাকে বলতে পার।

লোকটি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল, বলিল, আপনিই ডিটেক্‌টিভ বিনয়বাবু?—থানার ইনস্পেক্টর মহেন্দ্রবাবু আমায় আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে পাঠিয়ে দিলেন! এইমাত্র আমার মনিব রাস্তার উপর খুন হয়েছেন!

"রাস্তার উপর খুন! কোন রাস্তায়?"

বিনয়কুমার অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে উঠিয়া পড়িলেন। লোকটি বলিল—সুরি লেনে মশায়! আমাদের বাড়ীর খুব কাছেই এই কাণ্ড ঘটেছে! সন্ধ্যার পর আমার মনিব বাড়ী ফিরছিলেন, সেই সময় তাঁকে একলা পেয়ে কে খুন করেছে।

বিনয়কুমার বলিলেন,—সে রাস্তায় কি সন্ধ্যার পর লোকজনের যাতায়াত থাকে না?

"সে একটা গলি—শীতের সময় সন্ধ্যার পরই প্রায় নির্জ্জন হয়ে যায়।"

বিনয়কুমার প্রমথবাবুকে বলিলেন, আমায় এখনি ঘটনাস্থলে যেতে হবে! আমি আপনার কাজের ভার গ্রহণ করলুম। আমার সময় ও সুবিধামত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এ সম্বন্ধে আর যা কিছু দরকার, সে সব আমি পরে আপনার অফিসে গিয়ে দেখা করে ঠিক করে নোব।

পর মুহূর্ত্তেই তিনি আগন্তুকের সহিত ত্বরিত গতিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সুরি লেনের ভিতর হইতে একটা সরু গলি বাহির হইয়া গোমিষ লেনে গিয়া পড়িয়াছে। সেই গলির সামনে হত ব্যক্তি চিৎ হইয়া পড়িয়া ছিলেন! বন্দুকের গুলি তাঁহার মাথার ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল! চারিদিকের মাটি

রক্তে ভিজিয়া লাল হইয়া গিয়াছে! মাথার চার পাশে চাপ চাপ রক্ত জমিয়া ছিল।

ঘটনাস্থলে অত্যন্ত জনতা,—পুলিশ অনেক চেষ্টা করিয়াও লোকের ভিড় সরাইতে পারিতেছে না। স্থানীয় থানার ইন্‌স্পেক্টর মহেন্দ্রবাবু অনেক আগেই আসিয়াছিলেন।

বিনয়কুমারকে দেখিয়া তিনি বলিলেন এই যে আপনি এসেছেন! আমি এতক্ষণ আপনার অপেক্ষায় লাশ চালান দিতে পারিনি। বড় সাহেব এসেছিলেন,—তিনি বলে গেছেন, আপনি না আসা পর্য্যন্ত যেন কিছুতে হাত দেওয়া না হয়।

বিনয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার কি এখানকার তদন্ত শেষ হয়ে গেছে?

"এখানে ত বিশেষ কিছু জানতে পারি নি! গলির মুখে যে কনষ্টেবল ছিল, সে বলে, হঠাৎ সে বন্দুকের শব্দ শুনে ছুটে এসে, হত ব্যক্তিকে এই অবস্থায় দেখতে পায়। সে খুনীকে দেখতে পায় নি। হত ব্যক্তি মফঃস্বলের জমিদার নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—এখানে সুরি লেনেই বাড়ী। তাঁর খানসামা গোবিন্দ ও এখানকার দুজন ভদ্রলোক লাশ সনাক্ত করেছেন। এইটুকু ছাড়া এখনো আর কিছুই জানতে পারি নি।

"চুরীর মতলবে এ খুন হয় নি। নগেন বাবুর কোটের পকেটে ঘড়ি চেন, হাতের আংটি, মণিব্যাগ—কিছুই নষ্ট হয় নি। এ হত্যার মূলে কোনও রহস্য নিহিত আছে মনে হয়।"

বিনয়কুমার গভীর মনোযোগের সহিত হত ব্যক্তির কপালের উপরকার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিতেছিলেন।

নগেনবাবুর চক্ষু দুটি খোলা—মুখের ভাব অত্যন্ত বিকট; সহসা কোন ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলে বিস্ময় ও আতঙ্কে লোকের যেরূপ মুখের ভাব হয়, সেইরূপ মুখাকৃতি। তাঁহার দৃষ্টিহারা চক্ষু সম্পূর্ণ উন্মীলিত।

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—এ খুনের ব্যাপারে একটা কিছু জটিল রহস্য আছে বলে মনে হচ্ছে। এর তদন্ত করা বড় সহজ হবে না। দেখছেন না, এটা হঠাৎ করা হয় নি! হত্যাকারী অনেক সন্ধান রেখে, আট-ঘাট বেঁধে, এই নিরালা সময়টীতে কার্য্য সাধন করে নির্ব্বিঘ্নে সরে পড়েছে। সে অনেক দিন থেকেই হয় ত এই সুযোগ অন্বেষণ করছিল।

বিনয়কুমার মৃত দেহটি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—তা হয় ত হতে পারে। যে পথের উপর এই সন্ধ্যা রাত্রে মানুষ খুন করতে পারে, সে যে যত দূর সম্ভব আপনাকে নিরাপদ

রাখবার চেষ্টা করবে, সে আর বিচিত্র কি? তার কাজ সে করেছে,—এখন আমাদের কাজ আমাদের করতে হবে।

এই সময় একজন কনষ্টেবল এক যোড়া বিলাতি বার্ণিসের মূল্যবান জুতা আনিয়া মহেন্দ্রবাবুর সামনে রাখিল। যে গলির মুখে নগেনবাবু পড়িয়াছিলেন, সেই সরু গলিটার ভিতর একটা বাড়ীর দরজার পাশে জুতা যোড়া পড়িয়াছিল।

বিনয়কুমার জুতা যোড়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। ঐ গলির অধিবাসীরা সকলেই দরিদ্র। গলির ভিতর কেবল খোলার বস্তি,—সেখানে এ জুতা ব্যবহার করিবার মত লোক কেহ নাই। জুতার অধিকারী কোন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোক।

কনষ্টেবল বলিল—সেই গলির একজন লোক বলে, সে যখন সন্ধ্যার পর বাড়ী আসে, তখন কালো পোষাক পরা একজন ভদ্রলোককে গলির ভিতর হইতে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছিল।

বিনয়কুমার তাহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য কনষ্টেবলকে পাঠাইয়া দিলেন।

মহেন্দ্রবাবু বিনয়কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, রহস্য ক্রমেই গভীর হচ্ছে।

বিনয়কুমার এখানে আসিয়া একজন জমাদারকে জন-

তার মধ্যে সন্ধান করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। যদি সে কাহারও কথা ও গল্পের মধ্যে কোন সূত্র পায়, তাহা হইলে তাঁহাকে জানাইবে বলিয়া।

মহেন্দ্রবাবুর কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সেই জমাদার একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে সেখানে লইয়া আসিল।

সে বিনয়কুমারকে বলিল—ইনি সামনের বাড়ীতে থাকেন। খুনের সময় ইনি হত্যাকারীকে দেখেছেন বলায়, আমি ইঁহাকে ডেকে এনেছি।

বিনয়কুমার সেই স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি এই খুনের বিষয় কি জানেন? খুনীকে কি আপনি দেখতে পেয়েছিলেন?

স্ত্রীলোকটী বলিল—তা দেখেছি বই কি? না দেখলে যে আমি মিছে করে বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলবো, সে মানুষ আমি নই। যখন খুন হল, আমি ত তখন আমার রোয়াকটার উপর ঠায় দাঁড়িয়ে—সেই কথাই আমি এখন পাড়ার লোকদের বলছিলুম। (জমাদারকে দেখাইয়া) ইনি বল্লেন, আপনাকে এ সব কথা দারোগাবাবুর কাছে বলতে হবে। আমি বল্লুম,—তার আর কি? আমি যা দেখেছি, তা দশের সামনে বলবো, তাতে আমার ত কিছু ভয়ের কথা নেই!

বিনয়কুমার দেখিলেন—স্ত্রীলোকটি কিছু বাচাল প্রকৃতির। তিনি তাহাকে বলিলেন, আপনি যা জানেন, বা যা দেখেছেন, শুধু সেই কথা আমাদের বলে যান্ তা ছাড়া অন্য কোন কথার কিছু দরকার নেই! আপনি সন্ধ্যেবেলা প্রথমে কি দেখলেন?

বৃদ্ধা বলিল—সন্ধ্যেবেলা আমি তখন রান্নার যোগাড় করছিলুম। আজ হারাণ বলেছিল, মা! অনেক দিন তোমার হাতের মাংস খাই নি, আজ ও-বেলা মাংস রেঁধো। তা দেখ বাছা! আমার ঐ একটা ছেলেকে নিয়ে ঘরকন্না। সে যেদিন যা খেতে চায়, আমায় আগে তার যোগাড় করতে হয়। আর নিজের কথা অবিশ্যি নিজের মুখে বলতে নেই,—তবে মাংসটা আমার হাতে ওৎরায় ভালো। হারাণের বাপ বলতো, অনেক ভাল ভাল হোটেলের রান্না মাংস খেয়েছি, কিন্তু এমন মাংস কোথাও খাই নি। তা শুধু রাঁধলেই ত হয় না বাবা! ওর আবার সব তাগ্ বাগ্ চাই। আমি যে কৌশলটি বলে দেবো, তুমি যদি তোমার রাঁধুনিকে সেটি বলে দাও—

বিনয়কুমার অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু এখন ত মাংস রান্নার কথা হচ্ছিল না—এখন একটা বিশেষ দরকারী কথার—

হারাণের মা তৎক্ষণাৎ বলিল, তা ত ঠিক কথাই বাবা! কাজের কথা আগে, সে কি আর আমি জানি নি? এই আমি একটু বেশি বকি বলে কত্তা আমায় বলতেন,—গিন্নি? মেয়ে মানুষ তোমরা সময়ের দাম ত বোঝ না। সর্ব্বদা এত বাজে কথা বলে নিজের ও অন্যের সময় নষ্ট কোরো না। তা তিনি ভারি জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। বিদ্যেই কি তাঁর কম শেখা ছিল? ছেলেটা যদিও তাঁর মত হয় নি—

বিনয়কুমার বৃদ্ধার অনর্গল বাক্য-স্রোতে বাধা দিয়া বলিলেন, আপনি বুঝি সন্ধ্যার সময় আপনাদের রোয়াকে বসে ছিলেন? প্রথমটায় কি হলো?

হারাণের মা বলিল,—হল কি বাবা! উনুনে আগুন দিয়ে দেখি, ধোঁয়া আর বেরুতে চায় না, কেবলি ঘরের মধ্যে ঘুলোচ্ছে। মনে করলুম, সদরটা খুলে একটু বাইরে বসি। তাই মনে করে যেমন একটু দরজার কাছে এসেছি, তখনি একবার বন্দুকের শব্দ হল, আমি তাড়াতাড়ি দোর খুলে বাইরে আসতেই আর একবার—দেখলুম, ভদ্রলোক তখন ঐখানে পড়ে গিয়েছেন, আর ঐ সরু গলিটার ভিতর একজন লোক দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি ত প্রথমে ভয়ে একবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিলুম। তার পর একটু সামলে

লোকজন ডাকতে যাচ্ছি, তখন একটা পাহারাওলা গলির দিক থেকে এসে পড়লো, আর দুএকজন সেই সময় এসে পড়ায় গোলমাল পড়ে গেল!

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, আপনি ত খুনীকে দেখতে পেয়েছিলেন? তার সম্বন্ধে আর কিছু মনে করে বলতে পারবেন না? সে কেমন দেখতে? তার সঙ্গে আর কোন লোক ছিল কি না? তার কি রকম পোষাক পরা ছিল? এই সব বিষয় একটু ভেবে বলুন।

হারাণের মা একটু ভাবিয়া বলিল,—সঙ্গে তার আর কেউ ছিল না; সে আমি খুব ভাল করেই দেখেছি। তবে দেখতে সে কি রকম, তা কি করে বলব বাবা! চোখের নিমেষে একবার দেখতে না দেখতে সে তীরের মত ছুটে গলির অন্ধকারে মিশিয়ে গেল!

বিনয়কুমার বলিলেন, আচ্ছা, তার কি রকম পোষাক পরা ছিল বলে আপনার মনে হয়?

হারাণের মা উৎসাহিত হইয়া বলিল,—পোষাকের কথা যদি বল্লে বাবা! তা হলে বলি, আজ কাল কত রকম রকমের যে সব পোষাকের ছিষ্টি হয়েছে, সে কি আমরা জানি? আমার মনে হল, তার সর্ব্ব শরীর একটা কালো পোষাকে ঢাকা ছিল, তবে সেটা যে কি—আরবী

কি ফারসী পোষাক, সে আমি বলতে পারবো না। এই আমাদের মেয়েদেরই দেখ না—আগে আমাদের সময়ে ঐ এক সাড়ী—তা যে যা খুসী পর—ঢাকাই হোক্, বেনারসী হোক্, আর সূতিই হোক—যা করবার—ঐ এক সাড়ী। আর এখনকার মেয়েদের—বাবা। সে পোষাকের ধূম কি—সামিজ—কামিজ—ছায়া—

বিনয়কুমার বলিলেন—তা হলে আপনি এ বিষয়ে আর কিছু জানেন না?

সে বলিল, না বাছা! যা দেখেছি, সবই তোমায় বল্লুম। আমি হক্ কথার মানুষ—যা দেখিনি, বাহাদুরি নেবার জন্য যে মিছে করে বানিয়ে কিছু বোলবো, সে মানুষ আমি নয়। তাই পাড়ার সবাই বলে—

বিনয়কুমার পাড়ার লোকের মতামত শুনিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই বলিলেন—আচ্ছা, তা হলে এখন আপনি যেতে পারেন। আর আমাদের জান্‌বার কিছু নেই।

৩

পূর্ব্বোক্ত কনষ্টেবল এই সময় একজন নিম্নশ্রেণীর মুসলমানকে লইয়া আসিল। এই লোক হত্যাকারীকে গলির ভিতর হইতে দৌড়িয়া বাহির হইতে দেখিয়াছিল। মহেন্দ্র বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম?

"আমার নাম আবদুল।"

"কি কাজ কর?"

"আজ্ঞে, আমি রাজমিস্ত্রীর কাজ করি।"

"তুমি এই খুনের বিষয় কি জান?"

"আমি সন্ধ্যের সময় অন্য দিনের মত বাড়ী ফিরছিলুম, আমাদের বস্তির গলির মুখে যখন ঢুকতে যাচ্ছি, সেই সময় দেখলুম, গলির ভিতর থেকে কালো পোষাক পরা একজন ভদ্রলোক দৌড়ে চলে গেলেন। খুন যে হয়েছে, তা আমি তখন জানতুম না; তাই আমি সে দিকে মন না দিয়ে সোজা বাড়ী চলে এলুম।

"তাকে দেখলে আবার চিনতে পারবে? ভাল করে তাকে দেখেছিলে কি?"

"তা বোধ হয় পারবো। রাস্তার আলো সে সময় তাঁর মুখের উপর পড়েছিল—আমি একবার তাঁকে বেশ ভাল করেই দেখেছি। তাঁকে আরও ভাল করে দেখার কারণ এই যে, তাঁর পায়ে জুতো ছিল না। তিনি খুব ছুটে আসছিলেন, তবু বিশেষ কোন শব্দ হয় নি। তাই আমি তাঁর পায়ের দিকে চেয়েছিলুম। তিনি দৌড়ে যাচ্ছেন দেখে আমি আশ্চর্য্য হইনি ; মানুষের এমন কত দরকার থাকতে পারে। তবে তাঁর মত একজন বড়লোক এত ভাল পোষাক পরে শুধু পায়ে রাস্তায় চলছেন দেখে, আমি একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। সেইজন্য তাঁর কথা ভাল করে মনে আছে।"

"তুমি খুনের বিষয় কখন জানতে পারলে ?"

"আমি বাড়ী এসেই শুনলুম, স্বুরি লেনের নগেনবাবু রাস্তার উপর খুন হয়েছেন। তাই শুনে আমি এইখানেই আসছিলুম। এই পাহারাওলা সাহেবের হাতে একটা ভাল জুতো দেখে, আমি তখন প্রথমে যা দেখেছিলুম, তাই ওকে বল্লুম।"

"সে ভদ্রলোকের চেহারা কি রকম ? সে কি পোষাকই বা পরেছিল—তোমার বোধ হয় ?"

"তিনি খুব ফরসা, লম্বা, একহারা-চেহারা—বয়স খুব কম বলেই মনে হল। তাঁর গায়ে আর কি পোষাক ছিল বলতে

পারি নি, তবে শীতকালে বড় বড় বাবুরা যেমন গলা থেকে পা পর্য্যন্ত একটা কোট পরে, সেই রকম একটা কালো লম্বা কোট তাঁর গায়ে ছিল"।

"তুমি এ সম্বন্ধে আর কিছু জান ?"

"না হুজুর ! আমি আর কিছু জানি না।"

আবদুলকে বিদায় দিয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, তা হলে এখানকার কাজ আপনার শেষ হলে লাশ চালান দেওয়া যায়। এখানে আপনি কি আর কারুকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে যান ?

বিনয়কুমার বলিলেন, এখানে ত আর কেউ কিছুই জানে না দেখছি,—আপনি সেই যে লোকটিকে আমায় ডাকতে পাঠিয়েছিলেন, তাকে একবার ডাকুন,—তাকে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেই এখানকার কাজ শেষ হয়।

নগেনবাবুর ভৃত্য গোবিন্দ নিকটেই ছিল,—মহেন্দ্র বাবুর আহ্বানে সে বিনয়কুমারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনয়কুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নগেন বাবুর কাছে কতদিন থেকে কাজ করছ ?

"আজ্ঞে, তা অনেক দিন হলো--প্রায় বছর দুই হতে পারে।"

"কলকাতার বাড়ীতে কি তাঁর পরিবারের সকলেই থাকেন, না, তিনি একলা থাকতেন ?"

"এখানে বাবু একলাই থাকতেন। চাকর, বামুন, আর দেশের দু'একজন লোক—বাড়ীতে আমরা এই ক'জন এখন থাকি। মেয়েরা সব সময় থাকেন না। কখন কখন আসেন।"

"নগেন বাবুর স্বভাব চরিত্র কি রকম ছিল ? তিনি কি রকম প্রকৃতির লোক ছিলেন ? কারু সঙ্গে তাঁর কোন রকম শত্রুতা বা মনান্তর ছিল কি না, জান কি ?"

"তা মশায় ! তাঁরা বড় লোক—তাঁদের ভিতরের কথা আমরা চাকর-বাকর কি করে জানবো বলুন ? তবে তিনি ত লোক বেশ ভালই ছিলেন। আমাদের সঙ্গে কখন কোন মন্দ ব্যবহার করেন নি। তাঁর সঙ্গে যে এমন কারু সাংঘাতিক শত্রুতা থাকতে পারে, আমার ত তা মনে হয় না।"

"আচ্ছা, তিনি মারা যাবার আগে এমন কোন বিশেষ ঘটনা কিছু ঘটেছিল কি ? যার সঙ্গে এই খুনের ব্যাপারের কিছু যোগ থাকতে পারে, মনে করে দেখ।"

গোবিন্দ এ কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে এ প্রশ্নে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক ভাবনার পরও কোন সদুত্তর

না পাইয়া সে বলিল, কই, তা ত কিছু মনে হচ্ছে না। আজ সকালে ত বাবু বলেছিলেন, রাতের গাড়ীতে দেশে যাবেন। তা ছাড়া, আর ত বিশেষ ঘটনা কিছু হয় নি! আচ্ছা, আপনি কি রকম ঘটনার কথা ব'লছেন একটু বুঝিয়ে বলুন দেখি!

"এই ধর, যেমন কোথাও থেকে কোন চিঠি-পত্র এল, যা পড়বার পর থেকে তিনি কিছু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন; কিংবা হয় ত কোন নতুন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল—"

গোবিন্দ এবার সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, ঠিক ধরেছেন মশায়! কাল বিকেলে একজন লোক দেখা করতে এসেছিল বটে! আমি দরজাতেই ছিলুম, সে এসে আমায় বল্লে, বাবুকে বল গে, কাশী থেকে যোগেশ বাবু দেখা করতে এসেছেন। বাবুর শরীর সেদিন ভাল ছিল না বলে, তিনি প্রথমে দেখা করতে চান নি, শেষে যোগেশবাবুর জেদে দেখা করলেন।

বিনয়কুমার আগ্রহের সহিত বলিলেন তার পর তাঁদের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হলো, তা তুমি কিছু জানতে পেরেছিলে?

এ কথায় গোবিন্দ একটু অপ্রতিভ ভাবে মাথা চুলকাইয়া বলিল—তা তাঁদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল আমি কি করে জানবো বলুন। আমি ত সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম না।

তাহার মুখ দেখিয়া বিনয়কুমারের সন্দেহ হইল, সে কোন বিষয় গোপন করিতেছে। তিনি তাকে সাহস দিবার জন্য বলিলেন, তোমরা হলে রাতদিনের লোক,—চব্বিশ ঘণ্টা কাছে কাছে রয়েছ। ঘরের লোকের মত তোমাদের কাছে কি আর কোন কথা লুকোন থাকে হে? দু একটা কথা কি আর কাণে যায় নি? এতে দোষ কি? তুমি যা জান বল।

গোবিন্দ উৎসাহিত হইয়া বলিল, তা বাবু, সত্য কথা বলতে কি, প্রথমে আমি তাঁদের দিকে কিছু মন দিই নি। কিন্তু খানিক বাদে শুনলুম, যোগেশ বাবু অত্যন্ত রাগ করে খুব কড়া কড়া কথা বলছেন,—বাবু যেন নরম হয়ে তাঁকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। তাই শুনে আমি একবার গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলুম। বাবু যেন কোন মেয়েলোককে লুকিয়ে রেখেছেন, যোগেশ বাবু সেই কথা জানতে চাইলেন বলে বোধ হল।

মহেন্দ্রবাবুর মুখ হর্ষ-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বিনয়কুমারকে বলিলেন, এইবার ব্যাপারটা অনেকখানি বোঝা যাচ্ছে! তার পর গোবিন্দ! তুমি আর কি শুনলে, বলে যাও! যোগেশবাবু আর কি বল্লেন?

"তিনি খুব রেগে রেগে বল্লেন—'আমি তোমার অন্নে

ছাড়বো, তা মনে কর না। আজকের দিন তুমি ভেবে দেখ। যদি ভাল চাও, তাকে কোথায় রেখেছ—আমাকে বলতে হবে। আমি কাল বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। যদি ততক্ষণে আমার কথামত কাজ কর ভালই,—না হলে আমি এমন ভাবে এর শোধ নেবো, যা তুমি কখনো স্বপ্নেও মনে ভাবতে পার নি।' তার পর তিনি বেরিয়ে চলে গেলেন।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, তার পরে আর তাঁকে দেখেছ?

"না, তিনি আর আসেন নি।"

"তাঁকে দেখ্‌লে চিনতে পারবে ত? তাঁর চেহারা বেশ মনে আছে?"

"তা চিনবো বই কি মশায়! কাল তাঁকে বেশ ভাল করেই দেখেছি। খুব ফরসা রং, একহারা, লম্বা চেহারা, মাথায় কোঁকড়া চুল, আমার তাঁকে খুব মনে আছে"।

গোবিন্দর কথা শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু একবার বিনয় কুমারের দিকে চাহিলেন,—আবদুলের বর্ণনার সঙ্গে গোবিন্দর বর্ণনার কোন তফাৎ হয় নাই।

বিনয়কুমার বলিলেন, আর একটা কথা—নগেনবাবু আজ রাত্রে দেশে যাবেন, এ কথা আগে বলেছিলেন, না যোগেশ বাবুর সঙ্গে দেখা হবার পর বল্লেন?

"কাল পর্য্যন্ত ত কিছুই বলেন নি। আজ সকালে আমাকে এ কথা বলেছিলেন।"

বিনয়কুমার তাহাকে বিদায় দিয়া মহেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। এখন আপনি আপনার কর্ত্তব্য করতে পারেন।

অত্যন্ত চিন্তিত হৃদয়ে সে রাত্রে বিনয়কুমার বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। আবদুল ও গোবিন্দের জবানবন্দীতে যোগেশকেই হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ হয়। কিন্তু ইহারা কেহই তাহার কোন সন্ধান দিতে পারে নাই। কোন কিছু সূত্র না পাইলে কলিকাতার এই জন-সমুদ্রের ভিতর হইতে একটি লোককে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নয়। যে সময় তাঁহারা স্থরি লেনে বসিয়া খুনের তদারক করিতে ছিলেন, সে যে সেই সময় কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় নাই. তাহাই বা কে বলিবে?

টেবিলের উপর তাঁহার নামের একখানা পত্র পড়িয়া ছিল।

বিনয়কুমার দেখিলেন, তাঁহার বন্ধু বিমলের পত্র। সে লিখিয়াছে—

ভাই বিনয়! মাস খানেক আগে আমরা পটলডাঙ্গার বাড়ী ছেড়ে এখানে উঠে এসেছি। আসবার সময়

তাড়াতাড়িতে তোমাদের কারুকে বলে আসতে পারি নি। বাড়ীটার জায়গা অল্প বলে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হত। সেইজন্য একখানা বড় বাড়ীর সন্ধান পাওয়া মাত্র চলে আসতে হল।

এখানে এসে ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছিলুম। এবারে বেশ দিনকতক ভুগিয়েছে। এখন যদিও জ্বর ছেড়েছে, তবু দৌর্ব্বল্য ও শরীরের গ্লানি যায় নি।

এখানে চারিদিকেই খোলার বস্তি,—পাকা বাড়ী এক আমাদেরই। আর সব নিতান্ত সাধারণ লোকের বাস। তাই এক এক সময় একলা প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

আমাদের বাড়ীর পাশে একখানা ছোট পাকা বাড়ী আছে বটে—তবে সেখানায় যে কে বাস করেন, তা কেউ জানে না। আমি ত এই এক মাসের মধ্যে কারুকে দেখতে পাই নি। পাড়ার লোকেরও বাড়ীটা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। অথচ ওখানে মানুষ আছে, কাজ কর্ম্ম হচ্ছে, তা বেশ বোঝা যায়। প্রথম প্রথম আমাদের বড় বিস্ময় ও কৌতূহল হত,—এখন আর কিছু না জানতে পারলেও, এইটুকু জেনেছি, ঐ রহস্যময় পুরীতে একটি মহিলা বাস করেন।

দু একদিন তিনি বৌদির সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তুমি

হয় ত শুনে হাসবে, কিন্তু সত্য বলতে কি—তাঁর মত মধুর কণ্ঠস্বর আমি আর কখন শুনি নি। মানুষের স্বর যে এমন অপূর্ব্ব হতে পারে, এর আগে আমি কখন তা মনে ভাবতে পারি নি। যখন দূর থেকে আমি তাঁর সেই সঙ্গীতময় স্বর শুনি, তখন আমার মনে হয়, যার কথা এত মধুর, তার মুখ না জানি কত সুন্দর হতে পারে!

আমাদের ভিতর বাড়ীর দিকে তাঁদের একখানা ঘর আছে, সেই ঘরের একটা বন্ধ জানালার আড়ালে বসে তিনি মাঝে মাঝে বৌদির সঙ্গে কথা বলেন। বৌদি তাঁকে আমাদের বাড়ি আনবার জন্য কত চেষ্টা করেছেন, তাতে তাঁর মত নেই। বৌদি নিজে কতদিন তাঁদের বাড়ী যেতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি রাজি হন নি। এ কি রহস্য বলতে পারো?

রহস্য যাই হোক্, তবে আমার মনের মধ্যে যে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমার এই নিঃসঙ্গ সুদীর্ঘ মধ্যাহ্নের অবসর যেন কার কল-কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার শোনবার আশায় নিয়ত চঞ্চল ও তৃষিত হয়ে উঠছে। আর ঐ প্রাচীরের অন্তরালবর্ত্তিনীকে উপলক্ষ্য করে মনের মধ্যে যে কত কথা সঞ্চিত হয়ে উঠছে, সে আর কত বলব? ব্যাপারটা খুব রোমাণ্টিক নয় কি?

তুমি বোধ হয় খুব হাসছ? না সত্যি—ঐ বাড়ীটার ব্যাপার কি, জানবার একটা অদম্য কৌতূহল আমি কিছুতে চাপতে পারছি নি। তুমি ত এত গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াও—একবার এখানে এসে এই ঘরের গোয়েন্দাগিরিটা করতে পার না?

তোমার খবর কি? অনেক দিন ত তোমার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি। কেমন আছ? কি করছ জানিয়ো।

ভালো কথা—যে কথাটা বলবার জন্য চিঠি লিখতে বসেছি, সেইটেই বাদ দিয়ে এতক্ষণ অবান্তর কথা যথেষ্ট বলা হল। কাল রেণুর অন্নপ্রাশন—বৌদির বিশেষ অনুরোধ কাল সন্ধ্যার পর নিশ্চয় এখানে এসো। ১৫-নং চাঁপাতলা লেন, মনে থাকবে ত?

তোমার—বিমল

পত্র পাঠ করিয়া বিনয়কুমার মনে মনে হাসিলেন। টেবিলের উপর তখনো প্রমথবাবুর প্রদত্ত চিঠিপত্র অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া ছিল—সেই দিকে চাহিয়া তিনি নিজের মনে বলিলেন—একদিকে এই বিশ বছর আগেকার নিরুদ্দিষ্ট কন্যার সন্ধান, আর একদিকে আজিকার এই রহস্যজনক খুন; এই দুটি কাজের যতদিন নিষ্পত্তি না হয়, ততদিন

আমার আর কোন দিকে মন দিবার উপায় নাই। সথের গোয়েন্দাগিরি করবার কথা এখন ভাববার সময় কোথা? এখন দেখা যাক্, এই চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে প্রমথবাবুর কেস্‌টার কোন সুবিধা পাওয়া যায় কি না।

বিনয়কুমার চিঠির তাড়াটা তুলিয়া লইলেন, কিন্তু উপস্থিত সময়ে তাহার ভিতর কিছুতে মনসংযোগ করিতে পারিলেন না। নগেনবাবুর এই ভীষণ খুনের কথা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যা রাত্রে পথের উপর এই হত্যা-বিভীষিকা, মৃত ব্যক্তির সেই ভয়াবহ বিকট মুখচ্ছবি, ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছিল,—কিছুতেই তিনি তাঁহার মস্তিষ্ক ও চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না। যতই এ বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, ততই মন চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, কোন রমণীর জন্য নগেন বাবু ও যোগেশের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে এই হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, তাহা হইলেও যোগেশের সন্ধান কিরূপে পাওয়া যায়? যাহার জন্য এই দুইজনের ভিতর শত্রুতা জন্মিয়াছে, সেই রমণীর সন্ধানই বা কোথা হইতে জানা যায়? গোবিন্দ ত এ সব বিষয়ে কিছু জানে না, তাহার দ্বারা কোন সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে না।

বিশেষ, যোগেশ কাশী হইতে এখানে আসিয়া নগেনবাবুকে ধরিয়াছিল। তাহা .হইলে মূল ঘটনাটি কি কাশীতেই ঘটিয়াছিল ?

বিনয়কুমার ভাবিতে লাগিলেন, এই খুনের ব্যাপারের ভালরূপ তদন্ত করিতে হইলে, আগে নগেন বাবুর বিষয় বিশেষভাবে সন্ধান করা উচিত। তাঁহার জীবনের কোন বিষয় জানা না থাকিলে, খুনের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। তিনি নিজে কি প্রকৃতির লোক ছিলেন—যোগেশ কে, নগেনবাবুর সঙ্গে তাহার কি সূত্রে পরিচয়, এবং তাহাদের দুজনের মধ্যেই বা কে আসিয়া পড়িয়া এ কাণ্ড ঘটাইল, এ সব বিশেষরূপে সন্ধান লইতে হইবে। এখানে যদি সব কথা জানা না যায়, তাহা হইলে ইহার জন্য কাশীতে পর্য্যন্ত যাইতে হইবে।

পরের দিন প্রভাতে আফিস যাইতেই, বড় সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—সুরি লেনের খুনের কোন সূত্র পেলেন কি বিনয় বাবু? নগেন বাবু একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, পথের উপর এ ভাবে তিনি খুন হওয়ায় জন সাধারণ অত্যন্ত ভয় পেয়েছে। তাঁর হত্যাকারীকে শীঘ্র ধরতে না পারলে, আমাদের পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয় হবে!

বিনয়কুমার বলিলেন, কতক বিষয় জানা গিয়েছে।

তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভালরূপ প্রমাণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করে কোন কথা আমি বলতে চাই না। তবে আশা করা যায়, যত শীঘ্র সম্ভব একটা সুফল পাওয়া যাবে।

বড়সাহেব বলিলেন, আজ সকালে * * * থানার মহেন্দ্র বাবু এসেছিলেন। এ খুনটা তাঁর থানার এলাকার মধ্যেই হয়েছে। তাঁর কথাবার্ত্তায় মনে হল, তিনি নিজেও এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করতে চান। তুমি এ বিষয়ে কি বল?

"এর মধ্যে বলবার আর কি আছে? তিনি যদি এ কেস্‌টার ভার নেন্, আমার তাতে আপত্তি কিছু নেই। সন্ধান যেই করুক, অপরাধীকে ধরতে পারলেই কাজ হল। আপনি তাঁকে কি বলেছেন?"

"আমি কিছু বলিনি। কারণ, তিনি স্পষ্ট কোনও কথা বলেন নি। তবে কথার ভাবে আমার এই রকম মনে হল। যা হোক্, আপনি আপনার কাজ করে যাবেন। এ ব্যাপারটায় শীঘ্রই একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে আমি খুসী হব।"

বিনয়কুমার আফিস হইতে নগেনবাবুর বাড়ী গিয়া গোবিন্দের সঙ্গে দেখা করিলেন।

বেলা তখন দশটা। গোবিন্দ বাহিরের ঘরের জিনিষ

পত্র পরিষ্কার করিতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনয়কুমার বলিলেন —আমি তোমার কাছে আরো দু' চারটে কথা জানতে এসেছি। তুমি যে-সেদিন যোগেশবাবুর কথা বলেছিলে, এর আগে তাকে আর কখনো দেখেছ!

"আর কখনো দেখি নি। এই প্রথম দেখলুম। আর কি করেই বা দেখবো? তিনি ত এখানকার লোক নয়? বাবু এবার কাশীতে বেড়াতে গিছলেন, হয় ত সেই সময় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে থাকবে। তাঁর সম্বন্ধে আপনি কি জানতে চাইছেন?"

"তাঁর সম্বন্ধে এখন অনেক কথাই আমাদের জানা দরকার। উপস্থিত তিনি এখানে কোথায় থাকেন, সেইটা জানতে পারলেই অনেক কাজ হত। তুমি কি এ বিষয় জান কিছু?"

"আমি সে কথা জানি না বাবু! (আগ্রহের সহিত) তা হলে কি তাঁর উপরেই আপনারা সন্দেহ করছেন?"

"সে কথা এখন ঠিক বলতে পারা যায় না। তবে উপস্থিত ব্যাপার যে রকম দেখা যাচ্ছে, তাতে ত তাঁর উপর সন্দেহ হচ্ছে। সেই জন্য এখন আগে তাঁর বিষয় আমাদের ভাল করে জানতে হবে। তোমার মনিব কত-দিন আগে কাশী গিয়েছিলেন?"

"সে তো এবার ৺ পূজার সময় বেড়াতে গেলেন! মাস দুই সেখানে ছিলেন, এই দিন কতক আগে বাড়ি ফিরেছেন!"

"বাড়ী ফেরবার পরে কাশী থেকে তাঁর কাছে কোনও চিঠি পত্র আসতো কি?"

"তা তো আমি বল্‌তে পারি না মশায়! চিঠি পত্র ত অনেকই আস্‌তো, তবে কোনটা কোথা থেকে আস্‌তো তা কি করে জানবো বলুন!"

"আচ্ছা! তুমি এখন বাইরে যাও! আমি এখানে বসে তাঁর কাগজপত্র খুঁজে দেখবো! এই ড্রয়ারের চাবী কার কাছে থাকে?"

"এখন আমার কাছেই আছে"—বলিয়া গোবিন্দ একটা চাবির তাড়া টেবিলের উপর রাখিল।

বিনয়কুমার টেবিলের উপরকার কাগজপত্র সরাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। টেবিলের উপর একটা হাতবাক্স ছিল, তাড়ার চাবির সাহায্যে সেটা খুলিয়া ফেলিলেন। বাক্সে চিঠিপত্র, খরচের হিসাবের খাতা, ব্যাঙ্কের হিসাব বই ইত্যাদি ছাড়া তাহাতেও আর কিছু ছিল না।

তখন তিনি টেবিলের ড্রয়ারগুলি খুলিয়া তাহার মধ্যস্থ

জিনিষপত্র বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন। রাশীকৃত খাতা পত্র, জমীদারী সংক্রান্ত হিসাব নিকাশের খাতা, চিঠি পত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একটা টানার মধ্য হইতে একটি সুদৃশ্য জাপানী বাক্স বাহির হইল।

বিনয়কুমার বাক্সটি খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার মধ্যে দুখানা চিঠি ও একটি কাগজের মোড়ক ছিল।

তিনি মোড়কটি সরাইয়া রাখিয়া একখানা চিঠি খুলিয়া ফেলিলেন। নারীহস্তলিখিত ক্ষুদ্র পত্র—

"আমি আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি পত্রে যে সাহস ও ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছেন, তা দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমার আচরণ ব্যবহার বা গতিবিধি সম্বন্ধে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই। আমাকে এ ভাবে পত্র লেখবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? আমি আপনাকে ইতিপূর্ব্বেও যা বলেছি, এখনও তাই বলছি,—আমার সঙ্গে আপনার কোন সম্বন্ধ নেই, হতেও পারে না। আপনি বৃথা আমাকে এ ভাবে উত্যক্ত করবেন না। এ সম্বন্ধে এই আমার শেষ কথা জানবেন।"

পত্রে কোন স্বাক্ষর বা তারিখ কিছু ছিল না। বিনয়কুমার পত্রখানি হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তা হলে

গোবিন্দের জবানবন্দী থেকে যা আমি অনুমান করেছিলুম, কার্য্যকালেও ঠিক তাই হয়েছে দেখছি। এই রমণী যেই হোক, পূর্ব্বে এর সঙ্গে নগেনবাবুর নিশ্চয়ই সদ্ভাব ছিল,—যোগেশ এদের মধ্যে এসে পড়ায় এই বিরোধ ঘটেছে। নগেনবাবু এই বিরোধের ফলে প্রতিহিংসা পরবশ হয়ে শেষে তাকে জোর করে ধরে কোথাও আটক করে রেখেছে, কিম্বা তাকে হয় ত খুন করে এখানে পালিয়ে এসেছিল, কিছু ত বোঝা যাচ্ছে না। অসম্ভব কিছুই নয়! কারণ এ রকম রেষারেষির স্থানে যে লোকের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়, সে ত আমরা নিত্যই দেখ্‌তে পাই। মেয়েদের মধ্যে রেখে, পুরুষের এই প্রেম, দ্বন্দ্ব, মারামারি, কাটাকাটি, এ তো অনাদি কাল থেকেই চলে আসছে দেখছি। একবার কাশীতে গিয়ে সন্ধান না করলে এ ব্যাপারের কিছু স্পষ্ট বোঝা যাবে না। নগেনবাবু আজ খুন হয়েছে বটে, কিন্তু সে নিজেই খুনী কি না, তাই সর্ব্ব প্রথম দেখতে হবে।

বিনয়কুমার দ্বিতীয় পত্রখানি তুলিয়া লইলেন।

"আপনি আমার নিষেধ না মেনে আবার পত্র লিখেছেন। শুধু লেখা নয়—আমাকে সাবধানে থাকবার জন্য আদেশ দিয়েছেন। আমাকে এভাবে ভয় দেখাতে

আপনার একটু লজ্জা হল না ? আপনি জানেন -- শৈশবে আমি কাশীর দুর্দ্ধর্ষ বদমাইস গুণ্ডাদের দলে প্রতিপালিত হয়েছি। খুনোখুনী, দাঙ্গা হাঙ্গামা, ডাকাতি প্রভৃতি জীবনের যা কিছু চরম বীভৎসতা—তার সঙ্গে আমার আবাল্য যথেষ্ট পরিচয় আছে, ভয় বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব আমার মধ্যে কোন কালেই নেই। নিতান্ত কাপুরুষ না হলে আর আপনি আমাকে ভয় দেখিয়ে বশ করবার চেষ্টা করতেন না।

আপনাকে নূতন করে বলবার কথা আমার আর কিছু নেই। যা বক্তব্য ছিল, বারবার তা বলা হয়েছে। আপনাকে আমি আবার বলছি, আমায় আর উত্যক্ত করবেন না। মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আমি শান্তিতে থাকতে চাই বটে, তবে দরকার হলে যে শত্রুকে সহরের জনাকীর্ণ পথে কুকুরের মত খুন করতে পারি, এটা সব-সময় আপনি মনে রাখবেন।"

পত্রের শেষ দুই লাইন পড়িয়া বিনয়কুমার চমকাইয়া উঠিলেন, তাঁহার এতক্ষণের সুনির্দ্দিষ্ট চিন্তাসূত্র এই পত্র পাঠের পর যেন সহসা ছিন্ন হইয়া গেল!

"দরকার হলে শত্রুকে সহরের জনাকীর্ণ পথে কুকুরের মত খুন করতে পারি!" অবশেষে লেখিকার কথামতই

কাজ হয়েছে! তবে এতদিন ধরে যোগেশকে যে সন্দেহ করা হয়েছে, সে কি একেবারে ভুল? এই দুঃসাহসিকা নারীই কি তবে সেদিনকার এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মূলে আছে? তাই যদি হয়, তবে যোগেশ আবার কোন্ রমণীর খোঁজ করতে কাশী থেকে এখানে এসেছিল? কার সন্ধান পাবার জন্য সে নগেনবাবুকে ওরকম শাসিয়ে গিয়েছিল? নগেনবাবু কি একাধিক নারীর সঙ্গে এই রকম সম্বন্ধে জড়িত ছিল? আর এই যে পত্রলেখিকা রমণী—সে যেভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছে, তাতে ত তাকে সহজ মেয়ে বলে বোধ হয় না। এ রমণী কে? কোন্ সূত্রেই বা নগেনবাবুর সঙ্গে এর পরিচয়? এ যে রকম সমস্যা দেখছি, তাতে কোন দিক থেকে এবং কি সূত্রে যে এর সমাধান হবে, সে ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

বিনয়কুমার এইসব বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনে কাগজের মোড়কটি খুলিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার অজ্ঞাতে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বাহির হইয়া গেল! তিনি দেখিলেন, কাগজের মোড়কের ভিতর—একখানি ছবি! প্রমথবাবু নীরেনের স্ত্রীর যে ছবি তাঁহাকে দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিকৃতি!

৫

সুরি লেনের খুনের পরদিন সন্ধ্যার সময় * * * থানার ইনস্পেক্টর মহেন্দ্রবাবু ওয়েলিংটন স্ট্রীটের একটি চায়ের দোকানে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন। দোকানের হল ঘরখানি সে সময় সমবেত ভদ্রজনগণে পরিপূর্ণ ছিল। এবং সেখানে রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, ক্রীকেট ম্যাচ, রেসখেলা, এমন কি নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যের দৈনন্দিন দুর্ম্মূল্যতার বিষয়—সমস্তই বিশদভাবে আলোচিত হইতেছিল। কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর সে সব দিকে মনোযোগ ছিল না।

তিনি কোন দিনই বিনয়কুমারের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, উপস্থিত বুদ্ধি ও কার্য্যক্ষমতার গুণে অল্পদিনের মধ্যে এতটা উন্নতি ও প্রতিপত্তিই মহেন্দ্রবাবুর অসন্তোষের কারণ। তাঁহার মনের বিশ্বাস, সময় ও সুযোগ পাইলে সকলেই ওরূপ কার্য্যদক্ষতা দেখাইতে পারে। কিন্তু সকলকে ত আর সে সুযোগ দেওয়া হয় না। বিশেষ বড় সাহেবের যে কি সুদৃষ্টিতেই বিনয়বাবু পড়িয়াছে,

যেখানকার যা কিছু কাজ আসুক,—অমনি বিনয়কুমারকে ডাকিয়া সে ভার দিয়া তবে নিশ্চিন্ত। যেন বিনয়বাবু ছাড়া পুলিশ বিভাগে আর কার্য্যক্ষম ব্যক্তি দ্বিতীয় নাই।

শূন্য চায়ের পেয়ালা সরাইয়া রাখিয়া মহেন্দ্রবাবু পকেট হইতে পানের ডিবা বাহির করিয়া একটি পান মুখে পুরিলেন, ও সিগারেট ধরাইয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন—একবার কোন একটা জটিল ঘটনার তদন্ত করিয়া বড় সাহেবকে দেখাইতে পারা যায় যে, বিনয়বাবু ছাড়া অন্য লোকেও এ সমস্ত কাজ চালাইতে পারে, তবে তাঁহার মনের ক্ষোভ মেটে। উপস্থিত এই সুরি লেনের খুনটা বেশ জটিল বলিয়াই মনে হয় তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানাও গিয়াছে। এই ঘটনার বিষয় যদি তিনি নিজে স্বাধীনভাবে সন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তবে তাঁহার অনেক দিনের আশা পূর্ণ হয়। এতদিন পরে তাঁহার কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিবার একটি সুযোগ মিলিয়াছে।

"এ কি যোগেশ যে? তুমি কাশী থেকে কবে এলে হে?" অকস্মাৎ এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু চমকিতভাবে মুখ ফিরাইলেন। একটি যুবক দোকানে প্রবেশ করিয়াই কক্ষস্থ কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া সহাস্যে এই কথা বলিল।

প্রশ্নকারীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া মহেন্দ্রবাবু দেখিলেন—

তাঁহার পরের টেবিলে চা পান রত একটি যুবক ফিরিয়া চাহিল। তিনি উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

"কবে এলে হে? তুমি ত পশ্চিমে গিয়ে একবারে আমাদের সব ভুলেই বসে আছ! চিঠি লিখলে পর্য্যন্ত সময়ে উত্তর পাওয়া যায় না। তার পর—সব খবর কি? আছ কেমন সেখানে?"

"আছি ভালই, একটা বিশেষ দরকারী কাজের জন্য হঠাৎ চলে আসতে হয়েছে। তোমার সব কি খবর বল?"

"আমাদের আর খবর কি?—'যথা পূর্ব্বম্ তথা পরং' খবর তোমার কাছ থেকেই পাবার কথা—নতুন জায়গা থেকে কতদিন বাদে ফিরলে—তা এখন থাকবে ত কিছুদিন?"

"হপ্তা খানেক ত উপস্থিত আছি। তবে ঠিক বলতে পারি না। কাজটা না শেষ হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।"

"তা হলে চল—আজ শনিবার আছে—ষ্টারে "চন্দ্র-শেখর" দিয়েছে—দেখে আসা যাক্। তারা শৈবলিনীর পার্ট নেবে।"

"না ভাই! আজ নয়—আজ আমার একটা বিশেষ

দরকারী কাজ আছে—তা ছাড়া বাড়ীতেও বলে আসি নি—”

“কাজ কাজ করে যে ক্ষেপে উঠলে দেখছি? কি যে এত কাজের তাড়া পড়েছে, তার ঠিক নেই! যা কাজ আছে, সে কাল হবে এখন। আর বাড়ীতে খবর; সে আমি এখনি লোক পাঠিয়ে দিয়ে দিচ্ছি! কোথায় আছ এখানে?”

“এই কাছেই ২৫ নং করপোরেশন ষ্ট্রীট—কিন্তু সতীশ! আজ আমায় ছেড়ে দিতে হবে ভাই! যথার্থ বলছি—আজ আমি যেতে পারবো না। অত্যন্ত দরকারী কাজ, না গেলে চলবে না। কাল সকালে আমি নিশ্চয় তোমার বাড়ীতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব, কথা দিচ্ছি!”

“উঃ! দুদিন পশ্চিমে গিয়ে এ যে বিষম কাঠখোট্টা হয়ে উঠেছ দেখছি! এতকাল পরে দেখা—বন্ধুজনের একটা উপরোধ রাখতে পার না—এমনি কাজের মানুষ—আর আমরা—”

পরবর্ত্তী কথা আর শোনা গেল না। তাহারা দুইজনে বাহিরে চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবাবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিলেন।

সতীশের সম্বোধিত যোগেশ—গোবিন্দের বর্ণনামত—

একহারা, গৌরবর্ণ। তাহাদের কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল, সে সম্প্রতি কাশী হইতে আসিয়াছে।

মহেন্দ্রবাবু ভাবিলেন—উহার অনুসরণ করিবেন। তাহার পর মনে করিলেন—উপস্থিত যখন তাহার ঠিকানা পাওয়া গিয়াছে, তখন প্রথমে সেইখানে গিয়া তাহার সম্বন্ধে কিছু সন্ধান লওয়া উচিত। তাহার প্রতি যে সন্দেহ করা যায়, তাহা কতদূর সঙ্গত—এই সন্ধানের ফলে বোঝা যাইবে।

২৫ নং করপোরেশন্ ষ্ট্রীট্ বাহির করিতে বেশী বিলম্ব হইল না। বাহিরের ঘরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রবাবু তাঁহাকে যোগেশের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—যোগেশ এখানেই থাকে বটে, তবে এখন ত সে বাড়ীতে নেই। কখন আসবে, তাও কিছু বলে যায়নি। আপনার কি আবশ্যক বলে যান, সে এলে আমি তাকে বলব।

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—আমি নিজেই কাল সকালে আবার আসব অখন। তাঁর সঙ্গে দেখা করাই আমার বিশেষ দরকার। এ বাড়ী কি আপনার?

"হাঁ।"

"যোগেশবাবু কি আপনার আত্মীয়?"

"আত্মীয় ঠিক নয়। তবে ওর বাপের সঙ্গে আমার ছেলে-বেলাকার বন্ধুত্ব,—সেই সূত্রে এখন আপনার লোকের মত সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু আপনি এসব কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? যোগেশের সঙ্গে আপনার কি পরিচয় নেই?"

মহেন্দ্রবাবু তাঁহার পদোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন—পরিচয় ছিল না, তবে এখন আপনা থেকেই সেটা হয়ে যাবে। এখন তাঁর সম্বন্ধে আমার অনেক কথা জানতে হবে। আমি * * * থানার ইনস্পেক্টর—সুরি লেনে একটা খুন হয়েছে শুনেছেন বোধ হয়, সেই খুনের তদারকে আমি এখানে এসেছি।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের খুনের কথা শুনিয়া মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, খুনের তদারক এখানে কেন মশায়? আমরা নির্ব্বিরোধী লোক, আমাদের সঙ্গে কারো বাদ বিসম্বাদ নেই; আর যোগেশ ত এখানে থাকে না, সে কাশী থেকে তিন দিন মাত্র এখানে এসেছে।

"সে কথা আমরা জানি। আমরা প্রমাণ পেয়েছি, এই খুনের সংস্রবে তিনি লিপ্ত আছেন।"

"খুনের সংস্রবে—আমাদের যোগেশ?" বৃদ্ধ ভদ্রলোক অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত এই কথা বলিলেন। তাঁহার

মুখ দেখিয়া বোধ হইল—তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না।

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—হাঁ! যোগেশবাবুর কথাই বলছি! এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেছে! কাল তিনি কত রাত্রে বাড়ী এসেছেন, আপনি জানেন কি?"

"জানি বৈ কি! আমি ত তখন এই ঘরেই বসেছিলুম। কাল সে অন্যদিনের চেয়ে ফিরতে একটু দেরী করেছিল। রাত তখন প্রায় সাড়ে নয়টা। বল্লে—একটু বিশেষ কাজে পড়ে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। শরীরটাও আজ যেন ভাল বোধ হচ্ছে না, আমি আজ আর রাত্রে কিছু খাব না।—তার পর সে তাড়াতাড়ি তার ঘরে চলে গেল।"

"তখন তাঁকে প্রতিদিনের মত স্বাভাবিক ভাবেই দেখেছিলেন, না কোন রকম কিছু ভাবান্তর ঘটেছে বলে মনে হল?"

"সে এমন কিছু নয়, তবে তাকে যেন একটু চঞ্চল ও ব্যতিব্যস্ত বলে মনে হল। আমার বোধ হল—কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু সে ত দাঁড়াল না। তাই কিছু জিজ্ঞাসা করাও হয় নি।"

"কাল বিকেলে তিনি কখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন, মনে আছে?"

"সে বেলা পাঁচটার সময় বেরিয়েছিল। কিন্তু মশায়! সে যে এ রকম কোন কাজের মধ্যে থাকবে, এ কথা সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব। আমি নিশ্চয় বলতে পারি—আপনাদের এ ক্ষেত্রে কোন রকম ভুল হয়ে থাকবে।"

"জগতে অনেক সময় অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হয়, তার পরিচয় সংসারে অহরহ দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া এখন থেকে আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? যদি তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না দাঁড়ায়, আমাদের সন্দেহ যদি মিথ্যা হয়, তা হলে তাঁর ত কোন ক্ষতি হবে না? আপনাকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি তার ঠিকমত উত্তর দিয়ে যান্। তা হলেই বোঝা যাবে, এ সন্দেহ সত্য কি না। কাশী থেকে আসবার কি তাঁর আগে থেকেই কথা ছিল?"

"কথা আগে ত কিছু শুনি নি, সেদিন সে হঠাৎ এসে পড়ল। বল্লে একটা দরকারি কাজ পড়ায় তাড়াতাড়ি চলে আসতে হল, তাই আগে খবর দিতে পারে নি।"

"সে কাজটা যে কি, তা বোধ হয় আপনি কিছুই জানেন না?"

"তা মশায়! কি করে জানব বলুন! মানুষের নিজের এমন কত কাজ আছে—সে কথা আমি তাকে জিজ্ঞাসাই বা করতে যাব কেন?"

"আচ্ছা! আর একটা কথা—কাল বিকেলে তিনি বাইরে যাবার সময় কি রকম পোষাক পরে বেরিয়েছিলেন, আপনার মনে আছে ?"

"সে একটা কালো গলাবন্ধ, কালো ওভারকোট পরে বেরিয়েছিল। রাত্রে বাইরে থাকলে সে রোজই ঐগুলো ব্যবহার করে, কালও তাই করেছিল।"

মহেন্দ্র বাবুর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যোগেশ বাবুই যে খুনী, এ বিষয়ে তাঁহার আর কোনও সন্দেহ থাকিল না। কালো ওভারকোট পরা এই ভদ্রলোককেই আবদুল গলির ভিতর হইতে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছিল। হারাণের মাও একটা কালো পোষাক পরা লোককে গলির ভিতর ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছে। এই দুইজনের সাক্ষ্যে এ কথা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করা যাইবে। এবার এ মামলায় তাঁহার জয় অনিবার্য্য। এখনি বড় সাহেবকে সব কথা জানাইয়া যোগেশকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বিনয়কুমার যেরূপ ধূর্ত্ত ও চতুর,—সে যে এতক্ষণ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা কে জানে ?

মহেন্দ্র বাবু বৃদ্ধকে বলিলেন—আপনার সাক্ষ্য পরে আমাদের প্রয়োজন হতে পারে—আপনার নাম কি বলুন।

"আমার নাম রামসদয় মিত্র। আপনি কি যোগেশকে

এই খুনের ব্যাপারে দোষী বলে স্থির নিশ্চয় হয়েছেন? আমি কিন্তু আপনাকে মশায়! খুব জোর করে বলতে পারি, তার দ্বারা এমন সব কাজ একেবারে অসম্ভব। যে কেহ তাকে ভাল করে জানে, সেই এ কথা বলবে।"

"তাই যদি হয়, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে এ মামলা টেকবেই বা কেন? উপস্থিত যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, আমরা সেইমত কাজ করতে বাধ্য। পরে বিচারে যদি তাঁর দোষ না প্রমাণ হয়—তখন মুক্তি পাবেন, তার জন্য আর চিন্তা কি? তাঁর ঘরটা কোথায়? একবার ঘর-খানা আমার দেখা দরকার।"

"তার ঘর এই সুমুখেই, তবে এখন ত সে তালা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়েছে।"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন—"তা হলে আমি এখন উঠলুম। যোগেশবাবু ফিরে এলে আপনি এখন তাঁকে কোন কথা বলবেন না। আমি যে এখানে এসেছিলুম, এ কথা যেন কোন রকমে প্রকাশ না হয়।"

মহেন্দ্র বাবু পুলিশ আফিসে বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে নিজের সন্ধানের বিবরণ জানাইয়া শেষে বলিলেন—এখন যত দূর দেখা যায়, তাহাতে যোগেশ বাবুকে খুনী বলে সন্দেহ করা যাচ্ছে,—আমার মতে তাকে

এখনি গ্রেপ্তার করা উচিত ; বিলম্ব হলে সে এখান থেকে পালাতে পারে। সেই জন্য আমি এখনি তাকে গ্রেপ্তার করবার ও তার ঘর খানাতল্লাস করবার অনুমতি চাই।

সাহেব বলিলেন, তা হলে একবার বিনয় বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে তার পর এ কাজটা করলে ভাল হত না?

এ কথায় মহেশ বাবু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বিনয় বাবু এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন রিপোর্ট দেন নি। আমি নিজে সন্ধান করে যে যে প্রমাণ পেয়েছি, সে সবই আপনাকে জানালুম। এখন এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে আপনি যদি উচিত মনে করেন, তা হলে আমার কথা মত কাজ করবার অনুমতি দিন। না হয়, যা ভাল বুঝ্‌বেন, সেইরূপ কাজ হবে। তবে বিনয়বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমি কোন পরামর্শ করতে চাই না।

সাহেব কিছুক্ষণ ভাবিয়া শেষে বলিলেন—আপনি যদি সন্ধানের ফলে যোগেশকেই খুনী বলে স্থির সিদ্ধান্ত করে থাকেন, তা হলে সেই মতই কাজ করতে পারেন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।

মহেন্দ্রবাবু কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনায় হৃষ্টচিত্তে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে উঠিয়া পড়িলেন।

৬

সহসা এই অসম্ভব আবিষ্কারের ফলে বিনয়কুমার কিছুক্ষণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ছবিখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। এ ছবি নগেনবাবুর ঘরে কিরূপে আসিল? নগেনবাবু কি নীরেনের আত্মীয় ছিলেন? কিন্তু তাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? নগেনবাবু সম্ভ্রান্ত জমীদার—সেই দরিদ্র বিধবার কন্যার সহিত তাঁহার এমন কি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকিতে পারে? বিনয়কুমার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, কিন্তু এখন কাশীর সেই নিরুদ্দিষ্ট মেয়েটির সঙ্গে যে এই সুরি লেনের খুনের কোন একটা যোগ আছে, তাহা বেশ বোঝা যায়। বিনয়কুমার দেখিলেন—এ খুনের সব সূত্রই কাশী হইতে আসিতেছে। নগেনবাবু পূজার সময় কাশীতে গিয়াছিলেন। যোগেশ কাশী হইতেই এখানে আসিয়া নগেনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। নগেনবাবুর ড্রয়ারে যে চিঠি পাওয়া গিয়াছে, তাহার লেখিকা যে কাশীতেই বাস করে, বা করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, এবং সেই ছবিখানি যাহার, সে কাশীরই

নিবাসিনী ছিল, সম্ভবতঃ সেইখানেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। হয় ত প্রমথবাবুর ঘটনাটার মূল তথ্য জানিতে পারিলে এই খুনেরও রহস্য ভেদ হইতে পারে।

বিনয়কুমার বাড়ী আসিয়া প্রমথবাবুর দত্ত সেই চিঠির তাড়াটি খুলিলেন। সেই পত্রের লেখার সঙ্গে নগেন বাবুর পত্র লেখিকার লেখার অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। একখানা পত্র এইরূপ—

শ্রীচরণেষু—

ইতিপূর্ব্বে আপনার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ ও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা আপনাকে জানাইয়াছিলাম। এ পর্য্যন্ত আপনি আমাদের সামান্য একটা খবর লওয়াও কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। তবুও আবার আপনাকে বিরক্ত করিতেছি। আমি যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাতে মান-অপমান বিচার করিবার আমার অবসর নাই। আমার পুত্রটি সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, তাহার ঔষধ ও পথ্যের যথোচিত ব্যবস্থা করা আমার সাধ্যের অতীত। সেইজন্য আপনাকে সংবাদ দিলাম। আমাকেই উপলক্ষ্য করিয়া আপনাদের পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। আপনি যে কোন দিনই আমায় প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবেন না, সে আমি বিশেষরূপে জানি, কেবল আপনার পৌত্র পৌত্রীর

ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে পত্র লিখিতে হইতেছে। আমি কোনও দিন আপনার আশ্রয় বা সাহায্য লইব না, তবে এই শিশু দুটিকে যদি আপনি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইহাদের মঙ্গলের জন্য আমি সন্তানের উপর সমস্ত দাবী ত্যাগ করিব; ইহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। এ কথা স্বীকার করিয়া লইব। আপনি যেমন বিবেচনা করেন জানাইবেন। ইতি—

২-নং পত্র—

আজ দুই দিন হইল, আমার জীবনাধিক পুত্রকে হারাইয়াছি। সুখের বিষয়, আমাকে আর অধিক দিন স্বামী-পুত্রের দুর্ব্বহ শোক সহ্য করিতে হইবে না। আমি নিজেও মৃত্যুশয্যায়। আজ যদি মায়াও আমার সঙ্গিনী হইতে পারিত, তাহা হইলে আমি শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতাম। আমার মৃত্যুর পর এই কাশীর মত সহরে তাহার কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহা ভাবিলে আমার হৃৎকম্প হয়। যদি দয়া বা কর্ত্তব্য বোধে তাহার তত্ত্ব লওয়া উচিত মনে না হয়, অন্ততঃ আপনাদের বংশের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যও তাহাকে রক্ষা করুন। কাশীর চৌষট্টি যোগিনী ঘাটের কাছে গণেশ বাড়ীওয়ালার নিকট খোঁজ করিলেই তাহাকে পাইবেন। তাহার ডান হাতের মণি-

বক্ষে একটা ত্রিভুজাকৃতি জড়ুল আছে। আমার একখানা ছবি পাঠাইলাম। সে ঠিক আমারই মত দেখিতে হইয়াছে। এই ছবির সাদৃশ্যে তাহাকে চিনিতে কষ্ট হইবে না। আমার শেষ কর্ত্তব্য আমি করিয়া গেলাম। আপনার কর্ত্তব্য আপনি বুঝিয়া করিবেন। ইতি—

বিনয়কুমার পত্র দুইখানি পড়িয়া ছবিখানি আর একবার তুলিয়া লইলেন। হাস্যময় সুন্দর মুখ! ভবিষ্যতে যে প্রবল ঝটিকায় এই তরুণ জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া সমূলে উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে, ছবির প্রশান্ত মুখে কোথাও তার রেখা মাত্র নাই। এই দুর্ভাগিনী তরুণীর দুর্ভাগ্য জীবনের একটি সকরুণ চিত্র বিনয়কুমারের মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল। একদিন সে প্রেমাস্পদের অগাধ প্রেমই তার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় স্বরূপ গ্রহণ করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে সংসারের পথে যাত্রা করিয়াছিল। সমাজের তীব্র ভ্রূকুটী, স্বজন-বিচ্ছেদ, নানা বাধা-বিঘ্ন—কিছুই সেদিন তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই! কিন্তু তাহার পর? যেমন দিনের পর দিন অতীত হইয়াছে, তেমনি একে একে তাহার সকল আশা, সকল আনন্দের অবসান হইয়াছে। সংসার মানুষের পক্ষে মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র, এখানে কয়জনেরই বা আশা পূর্ণ হয়?

কিন্তু শুধু কি অভাব দারিদ্র্যের সঙ্গেই তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে! শুধু তাই নয়,—সে তাহার প্রিয়তমকে বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহার হৃদয়-বৃন্তের প্রস্ফুটিত কুসুম তাহারই ক্রোড়ে অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে! এবং তাহার পর? বিনয়কুমার দেখিলেন, জীর্ণ পর্ণকুটীরের ছিন্ন মলিন শয্যায় সে তাহার অন্তিমশয্যা পাতিয়াছে, তাহার সেই অপরিসীম সৌন্দর্য্য আজ পরিম্লান ও লুপ্তপ্রায়,—মৃত্যু সে মুখের উপর তাহার করাল ছায়া বিস্তার করিয়াছে, পার্শ্বে অপরিস্ফুট কুসুম-কলিকা-তুল্য মায়া! তাহাকে এই অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে তাহার এ শেষ মুহূর্ত্তও কি দারুণ উদ্বেগ ও অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! তাহার জীবনের প্রথম উষায় আজিকার এই চরম পরিণামের কথা কে ভাবিয়াছিল!

বিনয়কুমার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ছবিখানি আবার কাগজে মুড়িতে লাগিলেন। আহা! অনাথিনী মায়া! দুঃখিনী মায়া! মাতার মৃত্যুর পরে সংসারের প্রবল আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া কোন্ অকূলে না জানি সে ভাসিয়া গিয়াছে!

সহসা বিদ্যুচ্চমকের মত নগেন বাবুর পত্র-লেখিকার দুই ছত্র তাঁহার মনে উদয় হইল,—"আপনি জানেন শৈশবে

আমি কাশীর দুর্দ্ধর্ষ বদমাইস গুণ্ডাদের দলে প্রতিপালিত হয়েছি, খুনোখুনি, দাঙ্গা, হাঙ্গামা প্রভৃতি জীবনের যা কিছু চরম বীভৎসতা, তার সঙ্গে আমার আবাল্য যথেষ্ট পরিচয় আছে।"—মায়াই এই পত্র-লেখিকা!

সেই মুহূর্ত্তে সুরি লেনের খুনের রহস্য তাঁহার কাছে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইয়া গেল! এই মায়াকেই মধ্যে রাখিয়া যোগেশ ও নগেন বাবুর মধ্যে বিরোধ—এবং তাহারই ফলে এই হত্যাকাণ্ড! এখন কিন্তু প্রশ্ন এই,—হত্যাকারী কে? মায়া? না যোগেশ?

বিনয়কুমার পত্রের তারিখ ও সাল হিসাব করিয়া দেখিলেন—মায়ার বয়স এখন কুড়ি বৎসর হইতে পারে। হয় ত নিরাশ্রয় অবস্থায় কোন মন্দ আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া ঘটনাচক্রে এই অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে! তাঁহার অনুমান যদি সত্য হয়, তবে মায়াই নগেনবাবুর হত্যাকারিণী! এ চিন্তায় বিনয়কুমার মনে মনে বেদনা বোধ করিলেন। প্রমথবাবু একান্ত আশা ও স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে যাহার সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তাহাকে কি অবশেষে খুনী আসামী রূপে এতদিন পরে তিনি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিবেন?

সেই দিন সন্ধ্যার সময় বিনয়কুমার করপোরেশন্ ষ্ট্রীটের

একখানি দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই খুনের বিষয় এখন পর্য্যন্ত কোন একটা সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারায়, তিনি ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন। আজ সমস্ত দিন চিন্তার ফলে তিনি স্থির করিলেন, রাত্রে একবার প্রমথবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, এ পর্য্যন্ত যে যে বিষয় জানা গিয়াছে, তাঁহাকে জানাইবেন, ও সর্ব্ব প্রথম কাশী যাইয়া পত্রোক্ত চৌষট্টি যোগিনী ঘাটে গিয়া মায়ার বিষয় ভাল রূপে সন্ধান করিবেন।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। বিনয়-কুমার একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। পরে নিজের মনে বলিলেন—এতক্ষণ বোধ হয় তিনি আফিস হতে ফিরে থাকবেন—এখন গিয়ে তাঁকে সব কথা বলা যাক্। কৃপানাথ বসুর অতুল বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী সম্বন্ধে এ রকম সংবাদ শুনলে, তাঁর যে মনের ভাব কি রকম হবে, সে ত বোঝাই যাচ্ছে। আমি নিজেই এই মেয়েটির বিষয় এ রকম আবিষ্কারে কষ্ট বোধ করছি! এ ক্ষেত্রে আমার অনুমান যদি মিথ্যা হয়, তা হলে আমি অত্যন্ত সুখী হই; কিন্তু আমার যতদূর বিশ্বাস, প্রমথবাবুর মায়া—আর এই যাকে সন্দেহ করা যাচ্ছে—এ একই লোক। নগেনবাবুর ঘরে তাঁর ছবি থেকে ও পত্র থেকেই বোঝা

যায়, যে তাদের মধ্যে কতদূর ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে—

অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। বিনয়কুমার চকিতভাবে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, গোবিন্দ! তাহার মুখের ভাব অত্যন্ত উত্তেজিত,—ভয় ও উদ্বেগে সে তখন কাঁপিতেছিল। তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া সে অস্ফুট স্বরে বলিল "ঐ দিকে দেখুন বাবু! থামের নীচে দাঁড়িয়ে ওই যে কথা বল্‌ছে, ঐ সেই খুনী! ওই আমার মনিবকে খুন করেছে।"

বিনয়কুমার চাহিয়া দেখিলেন—গ্যাসপোষ্টের কাছে দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘাকার সুশ্রী যুবক আর একজনের সঙ্গে কথা বলিতেছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ও লোকটি কে?

সে বলিল—ওই ত সেই খুনী—যোগেশ রায়!

'যোগেশ রায়!' শুনিবামাত্র বিনয়কুমার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন—তুমি এঁকে প্রথম কোথায় দেখলে? ঠিক চিনতে পারছ—ইনিই তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?

"আমি ঠিক চিনেছি। এই দিক থেকে আমি যাচ্ছিলুম, হঠাৎ দেখি, ঐ চায়ের দোকান থেকে যোগেশ

বাবু এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে বেরিয়ে এলো! কি বুকের পাটা বাবু ওর! জলজ্যান্ত একটা মানুষ খুন করে কেমন সহজে এই সহরে ঘুরছে! ভয়ে আমার গা কাঁপতে লাগলো! কি করি ভাবছি, এমন সময় আপনাকে দেখতে পেয়ে এই দিকে এলুম!”

“আচ্ছা! তুমি এখন আমার কাছ থেকে সরে যাও! আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখলে, ওর মনে সন্দেহ হতে পারে। বিশেষ, ও যখন তোমায় চেনে। আমি এখন ওর উপর নজর রাখলুম। আমার দৃষ্টি এড়িয়ে ও আর পালাতে পারবে না। তুমি তোমার কাজে চলে যাও।”

“তাই করুন বাবু! একবারে পাহারাওয়ালা ডেকে ওকে গেরেপ্তার করে ফেলুন। যেন কোন মতে পালাতে না পারে।”

যোগেশ এই সময় তাহার সঙ্গীকে ছাড়িয়া দিয়া একলা চলিতে আরম্ভ করিল। বিনয়কুমার দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

যোগেশের গতির কোন স্থিরতা ছিল না। সে কখনও দ্রুতবেগে, কখনও বা ধীরে চলিতেছিল; কখনও বা কোন স্থানে নিতান্ত অন্যমনার মত দাঁড়াইতেছিল। বিনয়কুমার

মনে মনে ভাবিলেন—লোকটা হয় অন্য কোন লোকের জন্য অপেক্ষা করছে, আর না হয় ত কোন একটা বিশেষ সময়ের প্রতীক্ষা কর্‌ছে, না হলে এমন গদাই লস্করি চালের ত কোন মানে বোঝা যায় না।

প্রায় এক মাইল চলিবার পর যোগেশ একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বিনয়কুমার সেই গলির মুখে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন।

তিনি দেখিলেন, যোগেশ খানিক দূর গিয়া একটি ছোট বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল কিছুক্ষণ উপরের জানালার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ীর চারিদিকটা একবার ঘুরিয়া আসিল, আবার আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিনয়কুমার ভাবিলেন, এই বাড়ীর কাহারও সহিত বোধ হয় তাহার দেখা করিবার সঙ্কেত আছে, সেই জন্য সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে।

গলির ভিতর হইতে একটি লোক বাহিরে আসিল। বিনয়কুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ওই যে বাড়ীটার সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, ওই বাড়ীটা কার বলতে পারো? লোকটি একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, বলিল, মশায় বুঝি এ পাড়ার দিকের লোক নয়?

বিনয়কুমার বলিলেন, না—এদিকে আমি আজ প্রথম এসেছি। কিন্তু তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করছো কেন?

"কারণ এ অঞ্চলের সকলেই ওই ১৪ নম্বরের বাড়ীটার কথা জানে। ও বাড়ীতে যে কে থাকে, তা কেউ জানে না মশায়! মানুষ আছে, বোঝা যায় বটে, তবে কেউ কোন লোককে দেখতে পায় না। তাই নানা জনে নানা কথা বলে।"

"নানা জনে কি কথা বলে? আর মানুষ থাকলে কখন না কখন তাকে বেরোতেই হবে—তোমরা পাড়ায় থাক, অথচ কেউ কোন খবর রাখ না, এ ত বড় আশ্চর্য্য বলে মনে হচ্ছে?"

"আমরা মশায়! গরীব লোক, দিন ভোর খাটি সন্ধ্যার সময় এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ি—নিজের খবরই রাখতে পারি না, তা আবার পাড়ার লোকের খবর! কেউ কেউ নাকি রাত্তিরের সময় একটা কালো বোরকা পরা মেয়েমানুষকে ওই বাড়ীটায় ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। এক এক সময় বাড়ীটা থেকে নানা রকম শব্দ শোনা যায়। কেউ বলে ডাইনী—কেউ বলে পিশাচসিদ্ধ। আমার ত মনে হয়, ওটা ভূতুড়ে বাড়ী।"

লোকটি চলিয়া গেল। বিনয়কুমার অত্যন্ত বিস্মিত

হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—গলির মুখে লেখা আছে চাঁপাতলা লেন!

এ কি? এই গলিতেই বিমলের বাড়ী নয়? সে যে এই রকম একটা কি বিষয় আমায় লিখেছিল মনে হচ্ছে! তার নম্বরটা বোধ হয়—১৫

বিনয়কুমার যোগেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গলির ভিতর অগ্রসর হইলেন।

বিমল বাহিরের ঘরে বসিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিয়াই সহর্ষে বলিয়া উঠিল—এই যে? এতক্ষণে আসবার সময় হয়েছে দেখছি! চল! বৌদির কাছে! তিনি এর মধ্যে কতবার তোমার খোঁজ করেছেন।

বিনয়কুমার তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—অন্য সব কথা পরে হবে! এখন কোথায় বসলে তোমাদের পাশের বাড়ীটা দেখা যায়, সেইখানে আমায় নিয়ে চল। আমি একটি লোকের পিছন নিয়ে তোমাদের গলির মুখে এসে পড়েছি!

পাশের বাড়ী! বিমল একটু আশ্চর্য্য হইয়া বন্ধুর দিকে চাহিল, পরে তাহাকে একটা জানালার ধারে লইয়া গিয়া বলিল—এইখান থেকে ও বাড়ীটা দেখা যায়—কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি? কি হয়েছে যে এত রাত্রে কার পিছন নিয়ে এদিকে এসেছ?

বিনয়কুমার চাহিয়া দেখিলেন, যোগেশ অন্য মনে বাড়ীটার সামনে পায়চারী করিতেছে। তিনি বলিলেন, করপোরেশন ষ্ট্রীট থেকে এই লোকটির উপর কোন কারণে সন্দেহ হওয়ায়, আমি ওর পিছন নিয়ে আসছিলুম। তার পর প্রায় আধ ঘণ্টা হতে যায়,—লোকটা যে ওই বাড়ীটার আশে পাশে ঘুরছে, আর নড়ে না। তাই তোমার এখানে এসে আড়াল থেকে ওর গতিবিধি ভাল করে লক্ষ্য করব, ভেবে চলে এলুম।

বিমল মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল—ওঃ! ওই লোকটা? ওকেও আমি কালও সন্ধ্যার 'পর এই গলিতে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। ওকে চেন না কি তুমি?

"চিনতুম না। তবে দরকার পড়লে অনেককেই চিনে নিতে হয়। কিন্তু সে কথা যাক—ওই যে বাড়ীটার সামনে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, তুমি কি তোমার চিঠিতে আমায় ওই বাড়ীখানার কথা লিখেছিলে"?

"হাঁ! বাড়ীটার রহস্য কিছু বোঝা যায় না। প্রায় দেড় মাস এখানে এসেছি, একদিনের জন্য একটা লোক দেখিনি। অথচ ভিতরে একটি মহিলা যে বাস করেন, তার প্রমাণ সব সময় পাওয়া যায়। তাই ত তোমায় লিখেছিলুম, একবার সখের গোয়েন্দাগিরি করে দেখবে?"

"দেখতে পারলে ত হত! কিন্তু এখন এত কাজ রয়েছে হাতে, যে অন্য কথা ভাববার সময় নেই মোটে। এখানে দুদিন থাকতে পারলে আমি সব রহস্য ভেদ করে নিতুম। এই আজই ত তোমাদের পাড়ায় খবর পেলুম, ও বাড়ীটায় কালো বোরকা-পরা একজন মেয়ে থাকে। তোমরা সব চোখ কাণ বুঁজে থাক, ও খবর পাবে কোথা থেকে?"

বিমল অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ! তুমিও যেমন! বোরকা-পরা মেয়ে ওখানে আসবে কোথা থেকে? আমি তাঁকে দেখিনি বটে, তবে কতদিন তাঁর কথা শুনেছি ত? তিনি বাঙ্গালী মেয়ে, সে আমি জোর করে বলতে পারি। আমি শুধু এই ভাবি যে, এ রকম ভাবে নরলোকের দৃষ্টির অগোচর হয়ে থাকতে তাঁর সঙ্কল্প হল কেন? একবার তাঁকে দেখবার জন্য বৌদিতে আমাতে দুজনে মিলে কত দিন কত চেষ্টা যে করেছি, সে আর তোমায় কত বলব, কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারিনি।"

"বড় আশ্চর্য্যের কথা ত? বোধ হয় কোন ফেরারি আসামী হবে! না হলে এমন লুকোচুরীর ত কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।"

"নাঃ! তোমার মত ছুঁপিডের সঙ্গে আর বন্ধুত্ব রাখা

চলল না দেখছি! দিন রাত চোর ডাকাতের সঙ্গে থেকে থেকে তুমি একবারে অধঃপাতে গেছ! ফস্ করে একজন ভদ্র মহিলার নামে তুমি এমন একটা কথা বলে ফেল্লে?"

বিনয়কুমার হাসিয়া বলিলেন—ওঃ! বড় ভুল হয়ে গেছে! তোমার সামনে তাঁর সম্বন্ধে এমন কথাটা বলে ভাল করিনি ভাই! এই জন্যই ত তোমার মত ভাবুক কবি লোকের সঙ্গে আমার ঠিক তাল রেখে চলা পোষায় না! কিন্তু তুমি নিজেই বল না কেন—এ ছাড়া আর কি সম্ভব হতে পারে?

"আমার মনে হয়, কোন প্রবল লোকের অত্যাচারের ভয়ে তাঁকে এমন করে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। তিনি নিজে হয় ত অসহায়, শত্রুর সঙ্গে যোঝবার ক্ষমতা নেই, তাই এমনি করে লুকিয়ে রয়েছেন। আমার ত খুব মনে হয় যে, এই অনুমানটাই সত্য। তাই ত তোমায় বলি, যে এর মধ্যে কি ব্যাপার আছে, সন্ধান করে দেখা যাক্। যদি সত্যই তাই হয়, তা হলে কি আমাদের উচিত নয়, তাঁকে কোন রকম করে সাহায্য করা?"

বিনয়কুমার ভাবিতে লাগিলেন।

বিমল আবার বলিল—কিম্বা হয় ত এমনও হ'তে পারে, কোন সন্দিগ্ধ-স্বভাব স্বামী, সে হয় ত তার সুন্দরী স্ত্রীকে

কারু চোখে পড়তে দিতে চায় না, তারি জন্য এই ব্যবস্থা হতে পারা সম্ভব নয় কি ?

বিনয়কুমার বলিলেন—তুমি যা বোলছ, সে রকম হওয়া অসম্ভব নয় ; কিন্তু তা হলে ওবাড়ীতে কোন না কোন লোক থাকবে ত ? না হলে বাইরের কাজই বা হয় কি করে ? কোন লোকজনও কি বাড়ীতে কাজ করে না ?

"একটা ঠিকা ঝি আছে। সে দুপুর বেলা এসে কাজ করে যায়। বৌদি একদিন তাকে ডেকেছিলেন, সে বলে, কোন দিন সে আর কারুকে এ বাড়ীতে আসতে যেতে বা থাকতে দেখেনি। শুধু একটি মেয়ে থাকেন, এই সে জানে। তবে তাঁকেও সে কোনদিন দেখতে পায় না। নীচে দরজা খোলা থাকে. সে এসে কাজ কর্ম্ম করে দরজা ভেজিয়ে রেখে চলে যায়। উপরে ওঠবার তার হুকুম নেই।"

"আমি এমন অসম্ভব কথা কিন্তু আর কখন শুনি নি"—পথের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিনয়কুমার অত্যন্ত চিন্তিতভাবে এই কথা বলিলেন। যোগেশ তখনো সেই বাড়ীটার সামনে বেড়াইতেছিল।

বিমল বলিল—কিন্তু বিনয়! আমি তোমায় সত্যই বলছি, তাঁর কণ্ঠের স্বর যে কি মধুর, সে আমি কারুকে

বোঝাতে পারব না। যখন তাঁর কথা শেষ হয়ে যায়, তখনো যেন একটা অপূর্ব্ব ঝঙ্কার বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়াতে থাকে, আমার মনটা যেন এই অদ্ভুত রহস্যময়ী নারীর চিন্তায় দিন দিন উদাস হয়ে যাচ্ছে! চোখে না দেখে, শুধু অন্তর থেকে কথা শুনে যে কারো প্রতি এমন একটা আকর্ষণ জন্মাতে পারে, এক মাস আগে এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারতুম না। তুমি দুটি দিন আমার কাছে শুধু থাকো, তা হলেই তুমি নিজে অনেকটা বুঝতে পারবে। দুদিনে কি তোমার এমন কিছু বেশী ক্ষতি হবে?

বিনয়কুমার বলিলেন—এই হপ্তায় সুরি লেনে একটা খুন হয়ে গেছে, শুনেছ বোধ হয়? সেই জন্য আমায় বড় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে—হয় ত কালই আমি এই সন্ধানের জন্য কাশী চলে যেতে পারি। তুমি হপ্তা খানেক একটু ধৈর্য্য ধরে থাক, এর চেয়ে বেশি দেরি আমার কাশীতে হবে না। আমি সেখান থেকে ঘুরে এসে সর্ব্ব প্রথম এই বাড়ীটার সম্বন্ধে মনোযোগ দেব। শুধু যে একটু কৌতুহলের জন্য এ কথা বলছি, তা নয়। তোমার কাছে সব শুনে, আর ওই লোকটাকে এখানে দেখে, আমার অনেক সন্দেহ মনে আসছে। তবে এখন আমি কোন কথা বলতে

পারি না। যে খুনটার কথা বলছি, উপস্থিত এই লোকটির উপরই সে খুনের সন্দেহ করা যাচ্ছে। কিন্তু সে এখানে কেন? আমি সেই কথাই ভাবছি।

বিমল কিছুক্ষণ যোগেশের দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল এ লোক যদি খুনী হয়, সেটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বলতে হবে। কালও আমি ওকে এই গলিতে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস—যে এই মহিলাটির পিছনেও এই রকম কোন প্রবল শত্রু আছে। এক এক সময় এই কথা ভেবে ভেবে আমি এমনি উত্তেজিত হয়ে উঠি, তখন মনে হয়—একবার জোর করে বাড়ীটায় ঢুকে পড়ে কি ব্যাপার দেখে আসি, পরে যা হবার হবে।

বিনয়কুমার বলিলেন, সেই কাজটি কখন করবে না,—এ কথা আমি তোমায় বিশেষ করে বারণ করে দিয়ে যাচ্ছি। যদি ও রকম গোঁয়ারতুমি কর, তা হলে কোন কাজ ত হবেই না, আর যা হতে পারত, তাও পণ্ড হয়ে যাবে। আমি তোমায় বিশেষ করে বারণ করে যাচ্ছি, আমি কাশী থেকে না ফেরা পর্য্যন্ত তুমি কোন কিছু করবে না। যেমন আছ, ঠিক তেমনি থাকবে। এর মধ্যে আর যা কথা আছে, সে সব আমি ফিরে এসে বলবো।

অকস্মাৎ বিনয়কুমার চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন।

যোগেশ তখন গলির ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল।

তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বিমল ব্যস্ত হইয়া বলিল, ওকি! তুমি না খেয়ে দেয়ে যাও কোথায়? চল, একবার বাড়ীর ভিতর বৌদির সঙ্গে দেখা করবে, রেণুকে—

বিনয়কুমার যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, সে সব ফিরে এসে হবে! তুমি বৌদিকে বলো! এখন আমায় ওই লোকটির সঙ্গে থাকতে হবে। আর দাঁড়াবার সময় নেই! কিন্তু তোমাকে যে যে কথা বলে গেলুম, সেগুলি সব সময় মনে করে রেখো। আমার খুব বেশী দেরি হবে না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনয়কুমার গলি পার হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বিমল হতবুদ্ধির মত তাঁহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় আফিস যাইতেই বড় সাহেব বিনয়কুমারকে ডাকাইয়া বলিলেন "বিনয় বাবু! এবার আপনি বড় হেরে গেলেন দেখছি!"

"কি রকম?"

"সেই স্মরি লেনের খুনের কেস্‌টা ত আপনি এত

দিনেও কিছু করতে পারলেন না। আজ সকালে মহেন্দ্র বাবু খুনীকে গ্রেপ্তার করেছেন।"

"গ্রেপ্তার করেছেন! কাকে?" অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বিনয়কুমার বলিলেন "কোথায় তাকে গ্রেপ্তার করা হল?"

"২৫নং করপোরেশন ষ্ট্রীট! যোগেশচন্দ্র রায়! লোকটা কাশী থেকে এই মতলবে হালেই এখানে এসেছিল।"

বিনয়কুমাব বলিলেন,—আমি তাকে চিনি। গত রাত্রেও তার পিছনে এগারটা রাত পর্য্যন্ত ঘুরেছি। তাকে সন্দেহ করবার দু একটা কারণ আছে বটে, তবে বিশেষ প্রমাণ না পেলে তাকে খুনী বলে ধরতে পারা যায় না।

"প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে! তা ছাড়া সে নিজের মুখেই এ খুন একরকম স্বীকার করেছে! সেইটাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?" বলিতে বলিতে হাস্যোজ্জ্বল মুখে মহেন্দ্র বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন।

"খুন স্বীকার করেছে!" বিনয়কুমার আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার সমুদায় অনুমান, সমস্ত কার্য্যপ্রণালী গোলমাল হইয়া গেল!

মহেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন, "সে একরকম স্বীকার বই কি! ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়িয়েছে,—আসামী কাশীর অধিবাসী। নগেনবাবু গত পূজার সময় কাশীতে

বেড়াইতে গিয়েছিলেন, সেই সময় দুজনের মধ্যে পরিচয় হয়। এই দুজনের ভিতর কোন স্ত্রীলোক ছিল। ঘটনা-চক্রে তারই জন্য দুজনের মধ্যে মনান্তর ঘটে। নগেনবাবু স্ত্রীলোকটিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেও কলকাতায় চলে আসেন। আসামী মেয়েটিকে খুঁজে না পেয়ে, এখানে এসে তার সন্ধান জানবার জন্য জেদ ধরে, ও তাকে না পেলে ভয়ানক ভাবে শোধ নেবে বলে শাসায়। নগেন বাবু তার কথামত কাজ করতে রাজি ছিলেন না। তারই ফলে এই হত্যা!"

বিনয়কুমার উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "গল্পটি বেশ সুন্দর রচনা হয়েছে, বলতে হবে। কিন্তু শুধু রচনা হলেই ত চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে এ গুলো সবই প্রমাণ করতে হবে ত?"

মহেন্দ্রবাবু সদম্ভে বলিলেন,—নিশ্চয়ই প্রমাণ করবো। নগেন বাবুর চাকর গোবিন্দের সাক্ষ্যে প্রমাণ হবে যে, ঘটনার আগের দিন যোগেশ বাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি স্ত্রীলোকের কথা নিয়ে দুজনে বচসা হয়, যোগেশ বাবু বলেন, যদি কাল বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন মীমাংসা না হয়, তা হলে তিনি এমন ভাবে শোধ নেবেন, যা কেউ কখন স্বপ্নেও ভাবে নি।

যোগেশ বাবুর বাড়ীওয়ালা রামসদয় বাবুর সাক্ষ্যে প্রমাণ হবে, ঘটনার দিন যোগেশ বাবু বেলা ৫টার পর বেড়াতে যান, রাত সাড়ে নয়টার সময় অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও চঞ্চলভাবে বাড়ী ফেরেন। তিনি শরীর অসুখের ছুতো করে এসেই নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। কারও সঙ্গে দেখা করেন নি। তার পর দিন বাড়ীর লোক ওঠবার আগেই বেরিয়ে যান। অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরেন। এ দুই দিনের অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

বিনয়কুমার অচঞ্চল ভাবে বলিলেন, এ সবেরও অন্য কোন কারণও থাকতে পারে। খুনের পক্ষে এ গুলো এমন কিছু মারাত্মক প্রমাণ নয়। আর কি প্রমাণ আছে ?

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন—খুনের সময় চাক্ষুষ সাক্ষীর সাক্ষ্যে জানা যায়, কালো পোষাক পরা একজন লোককে তারা ছুটে যেতে দেখেছে। রামসদয় বাবু বলেন, ঘটনার দিন যোগেশ বাবু কালো ওভারকোট কালো গলাবন্ধ পরে বেরিয়েছিলেন।

এবার আর বিনয়কুমার সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তবে কি এইকালো ওভারকোট পরা যোগেশ-কেই হারানের মা ও আবদুল ছুটে পালাতে দেখেছিল ?

তাঁহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া বিজয়োল্লাসে মহেন্দ্র বাবুর মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার হাতের একটা কাগজের মোড়ক টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, আর এই শেষ প্রমাণটা দেখলে বোধ হয় আমার নবীন বন্ধুর আর কোন সন্দেহ থাকবে না।

তিনি মোড়ক খুলিয়া একটা কালো ওভারকোট তুলিয়া ধরিলেন, তাহার স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া দাগ হইয়া রহিয়াছে।

এক মুহূর্ত্তে ঘরের সকলেই নির্ব্বাকভাবে সেই রক্তমাখা কোটের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকালের জন্য গৃহ নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

মহেন্দ্র বাবু ক্ষণকাল পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—এ ছাড়া ঘটনার দিন বস্তির মধ্যে যে বিলাতী বার্ণিসের জুতো পাওয়া যায়, রামসদয় বাবু সেটা যোগেশ বাবুর বলে সনাক্ত করেছেন। যোগেশ বাবু নিজে এ সব প্রমাণের কোন প্রতিবাদ করেন নি। আবদুল তাঁকেই শুধু পায়ে গলির ভিতর থেকে ছুটে যেতে দেখেছিল বলে সনাক্ত করেছে। গোবিন্দও তাঁকেই নগেন বাবুর ঘরে দেখেছিল বলে স্বীকার করেছে। (বড় সাহেবের

প্রতি) এই সব প্রমাণই কি যোগেশ বাবুর বিরুদ্ধে যথেষ্ট হতে পারে না ?

বড় সাহেব একবার বিনয়কুমারের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার ভাবে মনে হয়, তিনি মহেন্দ্র বাবুর এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বিনয়কুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি অনিচ্ছার সহিত বলিলেন—বিনয় বাবু! আমার ত মনে হয়, এক্ষেত্রে মহেন্দ্র বাবুই ঠিক! নয় কি ?

বিনয়কুমার তখন বড় সাহেবকে বলিলেন,—মহেন্দ্র বাবু যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, তার বিপক্ষে আমার কিছু বলবার নেই। আপাত দৃষ্টিতে এই গুলিই যথেষ্ট বলে মনে হয়, কিন্তু আমার এখনও মনের দৃঢ় বিশ্বাস, যোগেশ বাবু খুনের সংস্রবে থাকলেও খুনী নয়। কেন যে আমার এই মত, তা আমি এখন প্রকাশ করতে চাই না। তবে আমি এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হবার জন্য একবার কাশীতে গিয়ে সন্ধান করতে যাই। হয় ত আমার খুব বেশী দেরি হবে না, কিন্তু আমার অনুরোধ, আমি না আসা পর্য্যন্ত আপনারা আসামীর নামে কেস রুজু করবেন না।

সেই দিনই বিনয়কুমার হাজতে গিয়া যোগেশ বাবুর

সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার আকৃতিতে ভয়ের কোন লক্ষণ ছিল না। সেই প্রিয়দর্শন তরুণ মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনয়কুমারের পূর্ব্বের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়া গেল। তিনি মনে ভাবিলেন, এ লোক যদি সত্যই মহেন্দ্র বাবুর কথা মত খুনী হয়, তাহা হইলে তিনি এ কার্য্য ছাড়িয়া দিবেন।

বিনয়কুমার যোগেশ বাবুকে বলিলেন—আমি আপনাকে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। প্রকৃত উত্তর দেবেন কি ?

যোগেশ বাবু বলিলেন—আমায় এখানে আনা পর্য্যন্ত অনেকেই অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনার যা বলবার আছে বলুন, আমি যদি সে বিষয়ে কিছু জানি, নিশ্চয়ই প্রকৃত উত্তর দিব।

"আমি প্রথমতঃ বল্‌তে চাই, যে যে-অপরাধের জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমিও যেমন নির্দ্দোষ, আপনিও ঠিক তাই। কিন্তু আপনি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলছেন না কেন ? এতে ত আপনার কেস্ আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

"আমার বলবার কিছু নেই বলেই আমি কোন কথা বলি নি।"

"তবে কি সত্যই আপনি এ খুন করেছেন ?"

"পুলিশে যখন আমার বিপক্ষে এত প্রমাণ পেয়েছে, এবং তারা যখন বলছে, তখন আমিই করেছি বই কি ?"

বিনয়কুমার অধীর হইয়া বলিলেন,—পুলিশে যা খুসী বলুক না, আপনার নিজের দিক থেকে ত একটা কিছু বলবার আছে ? আপনি কি বলেন ?

"আমি ত বলেছি, আমার কিছু বলবার নেই।"

বিনয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—কাল রাত্রি ৭-টা থেকে ১০-টা পর্য্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন ?

যোগেশ বাবু এ প্রশ্নে একটু চমকিত ভাবে বিনয়কুমারের মুখের দিকে চাহিলেন, পরে বলিলেন—ঠিক মনে নেই, পথে পথে ঘুরছিলুম।

"কিন্তু আমি জানি, আপনি করপোরেশন ষ্ট্রীটের চায়ের দোকানে চা খেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করছিলেন। তারপর চাঁপাতলা লেনের একটা গলির ভিতর ১৪ নং বাড়ীর সাম্‌নে অনেকক্ষণ ঘুরে শেষে ২৫ নং করপোরেশন ষ্ট্রীটে ফিরে আসেন।"

যোগেশ বাবু অবাক্ ভাবে বিনয়কুমারের মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার প্রফুল্লতা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছিল, তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন—আপনি অনেক খবর রাখেন দেখছি !

বিনয়কুমার বলিলেন—আপনি যদি শুনতে চান, তা হলে আরও অনেক খবর দিতে পারি। ১৪ নং বাড়ীতে যে স্ত্রীলোকটি থাকেন, তিনি যে আপনার ও নগেন বাবুর সঙ্গে কতটা সংশ্লিষ্ট তার অনেক খবরই জেনেছি। শুধু মাঝখানের দু একটা কথা না জানায় সবটা ঠিক মিলছে না। খুন নিশ্চয়ই আপনার দ্বারা হয় নি, তবে আপনার যা জানা আছে, যদি বলেন, তা হলে আপনারও কষ্ট ভোগ করতে হয় না, আমারও অনেক পরিশ্রমের লাঘব হয়।

যোগেশ বাবু নত মস্তকে ভাবিতে লাগিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বিনয়কুমার আবার বলিলেন—যদি এর মধ্যে এমন কোন গোপনীয় কথা থাকে, যার জন্য আপনি কোন কথা বলতে সঙ্কুচিত হতে পারেন, সে কথা কখন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ পাবে না। পুলিশে কাজ করি বটে, তবে এখনো সম্পূর্ণরূপে ভদ্রতা বিসর্জ্জন দিয়ে চরমে উপস্থিত হতে পারি নি। আপনি স্বচ্ছন্দে আমায় বিশ্বাস করতে পারেন।

যোগেশ বাবু এবার মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। বলিলেন—আপনি মশায়! বড় ভদ্রলোক। কিন্তু যথার্থই আমার কোন কথা বলবার উপায় নেই। এ

সম্বন্ধে আমাকে আর কোন অনুরোধ করা বৃথা বলে জানবেন।

বিনয়কুমার বলিলেন—তা হলে অবশ্য আমাকেই চেষ্টা করে সকল তথ্য জানতে হবে। এমন তবে উঠি—আবার শীঘ্রই দেখা হবে।

সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেণে বিনয়কুমার কাশী যাত্রা করিলেন।

৯

সন্ধ্যার রক্তরাগরঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিয়া নিতান্ত অন্য মনে বিমল তাহাদের দ্বিতলের বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দিনান্তের শেষ আলো ও সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে ম্লান রবিকর-সম্পাতে নীল আকাশের গায় অসংখ্য মেঘের প্রাসাদ উচ্চচূড় তরঙ্গায়িত পর্ব্বতশ্রেণীর রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়া আবার নিঃশব্দে মিলাইয়া যাইতেছিল। অসীম গাম্ভীর্য্যময় অনন্ত আকাশে এই বিচিত্র খেলা যুগ যুগান্ত কাল চলিতেছে, তার তলে মানবের এই অশেষ আকাঙ্ক্ষাময় জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্না—ইহার শেষ কোথায়, কে বলিতে পারে?

সন্ধ্যার নীরব সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা অতি করুণ বিষণ্ণতা মাথান আছে,—খোলা বারান্দায় মুক্ত আকাশের

নীচে দাঁড়াইয়া বিমল এই কথাটা মনে মনে অনুভব করিতেছিল। তাহার নিজের জীবনও যেন আজ তাহার কাছে নিতান্ত অকরুণ একটা প্রহেলিকাময় বলিয়া মনে হইতেছিল।

আজ প্রায় দুই মাস হইতে যায়, সে ১৪ নম্বরের সেই রহস্যময়ী মহিলাটিকে ভালবাসিয়াছে! এ কথা সে নিজের কাছে স্বীকার করিতেও লজ্জা পায়। যাহাকে সে কখনো চোখে দেখে নাই, তাহাকে ভালবাসিল কিরূপে? কিন্তু এ কথাও সত্য, যদি সে অন্যান্য সকলের মত তাঁহাকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে কি এখনকার অপেক্ষা তাহার অনুরাগ বাড়িয়া যাইত? প্রথমে সে শুধু তাঁহার কণ্ঠের স্বরই শুনিয়াছিল, সেই সঙ্গীতময় স্বরের মাধুর্য্য—কথা শেষ হইয়া গেলেও যাহার রেশটুকু ঘরের বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইত, সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরই প্রথম তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর হইতে সকল কথা, সকল কাজ কর্ম্মের মধ্যে সে শুধু সেই মধুর স্বর শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কিন্তু তখনো সে তার এই মনোভাবকে কেবলমাত্র কৌতূহল বলিয়াই জানিত।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু এ চিন্তা তাহার চিত্ত হইতে সরিয়া গেল না, বরং বদ্ধমূল হইয়া বসিতে

লাগিল। সেই অশ্রুতপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর বিশ্লেষণ করিয়া সে নিজের মনে কত ভাঙ্গাগড়া, কত তোলাপাড়া করিত, তাহার শেষ ছিল না। তাহার মন তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, যাহার স্বর এত মধুর, তাহার মুখ যে কত সুন্দর সে কথা বর্ণনার অতীত। অহর্নিশি তন্ময় হইয়া সেই অপূর্ব্ব রূপসীর চিন্তা করিতে করিতে কবে যে সে নিজেকে সেই চিন্তার মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, সে নিজেই সে কথা জানে না। শুধু একজনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া যে কাহারও মানসপটে এমন একটি সজীব মানসী প্রতিমা গড়িয়া উঠিতে পারে, এ কথা সে আগে ভাবিতে পারিত না। কিন্তু আজ সে জানে, ঐ দেওয়ালের অন্তরালে যে অসূর্য্যম্পশ্যা রহস্যময়ী তরুণী লুকাইয়া আছে, তাহাকে সে কল্পনায় কত সৌন্দর্য্যে কত সুষমায় ভূষিত করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

যদি সে বাস্তবে তেমন সৌন্দর্য্যময়ী না হয়? সে কথা বিমল অনেক বার ভাবিয়া দেখিয়াছে। তৎসত্ত্বেও তাহার মনোভাবের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। রূপ যদি নাই থাকে, তাতে ক্ষতি কি? রূপ ক্ষণস্থায়ী—নিতান্ত বাহিরের জিনিস। যে যথার্থ ভালবাসে, সে কি দেহের আকাঙ্ক্ষা, রূপের, ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা মনে আনিতে পারে? সে না

ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই ভালবাসে! সে যাহাকে ভালবাসিয়াছে, সে যদি রূপহীনা হয়, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে তাহার অতীত জীবনে কোন গভীর রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে। সে কি রহস্য? যদি তাহার জীবনে কোন কলঙ্ক থাকে? সে কথাও বিমল ভাবিয়া দেখিয়াছে, তাহাতে তাহার মনে কোন দ্বিধা আসে নাই। তাহার হৃদয়ের অগাধ প্রেমে সে তাহার অতীত জীবনের সকল কালিমা মুছিয়া দিবে। তাই যদি সে না পারে, তবে তাহার কিসের ভালবাসা?

যদি সে কোন প্রবল শত্রুর শাসনে এই ভাবে থাকিতে বাধ্য হইয়া থাকে? এই কথাটা ভাবিলেই বিমলের সমস্ত শরীরের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে থাকে, এই কথাটাই একান্ত সত্য বলিয়া তাহার মনের বিশ্বাস। তাহার চোখের উপর একজনের উপর এমন নির্য্যাতন হইতেছে, সে কি দেখিয়াও কোন প্রতিবিধান করিতে পারিবে না! অন্যায়ের দণ্ড দিবার অধিকার ত সকলেরই আছে!

কতদিন তাহার মনে হইয়াছে, এক দিন যে কোন সূত্রে সে বাড়ীটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া সমস্ত রহস্য জানিবার চেষ্টা করিবে। যদি তাহাতে কোন বিপদ ঘটে, সে জন্য সে

কিছুমাত্র ভয় করিবে না। জগতে এমন কোন বিপদ্ আছে, যাহার মধ্যে সে তাহার প্রিয়ের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতে ভয় পায়? কেবল বিনয়ই তাহাকে এই হঠকারিতা হইতে নিরস্ত করিয়াছে।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিমল একবার সেই বাড়ীটার দিকে চাহিয়া দেখিল। সে পাষাণ প্রাচীর তেমনি মূক নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সে তাহার সমস্ত প্রাণ মন দিয়া যাহাকে একান্ত ভাবে চাহিতেছে, ওই জড় প্রাচীর তাহাদের মধ্যে এই অলঙ্ঘ্য ব্যবধান তুলিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, এ ব্যবধান কি তাহাদের জীবনে কোন দিন দূর হইবে না?

বিমল অধীর ভাবে বারেন্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিনয় আজ দশ দিন হইতে নিরুদ্দেশ,—কবে যে ফিরিবে তাহারও স্থিরতা নাই, কিন্তু আর ত তাহার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকা চলে না। সে এই কাজের ভিতর থাকিয়া একবারে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, যাহার নিজের মনেরই কোমল প্রবৃত্তি গুলি শুকাইয়া গেল, সে আর অন্যের মনের আকুলতা বুঝিবে কেমন করিয়া? বিমল স্থির করিল—সে নিজেই আজ একটা শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

সন্ধ্যার ধূসরতা ক্রমে জ্যোৎস্নার রজতধারায় মিলাইয়া গেল। বিমল ঘরে ফিরিয়া টেবিলের ধারে বসিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল—

"যে দিন প্রথম তোমার কণ্ঠ শুনেছি, সেই দিনই তোমায় ভালবেসেছি, এ কথা তুমি হয় ত বিশ্বাস করবে না। আমি তোমায় কি করে জানাব, আমার অন্তর তোমার কাছে নিজেকে নিবেদন করে দেবার জন্য কি অধীর হয়ে উঠেছে! আমি আজ ছ মাস ধরে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত বিক্ষত হয়েছি, আর আমার ধৈর্য্য নেই, তাই আজ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য এই শেষ চেষ্টা করতে বসেছি!

"তুমি কেন এমন গুপ্ত ভাবে থাক? কোন শত্রুর শাসনের জন্য কি তোমাকে এমন ভাবে থাকতে বাধ্য হতে হয়েছে? আমার এই সবল হৃদয় তোমাকে প্রবলের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে! আমি তোমার জীবনের কোন কথাই জানতে চাই না, শুধু তোমায় অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে চাই! আমায় যদি অন্য ভাবে নিতে না পার, তবে শুধু তোমার বন্ধু বলে গ্রহণ কর, শুধু তোমার পাশে দাঁড়িয়ে সংসারের সকল রূঢ়তা, সকল অত্যাচার থেকে তোমায় রক্ষা করবার অধিকার দাও!

"আমি যে কে, তা বোধ হয় তোমাকে আর পরিচয় দিয়ে জানাতে হবে না। এই দোতালার বারান্দায় বসে তোমাকে একটিবার দেখবার জন্য, তোমার একটি কথা শোনবার জন্য, কত দিন, কত রাত তৃষিত বিনিদ্র নয়নে কাটিয়েছি, সে কি তোমার দৃষ্টি এড়াতে পারে? আমার অন্তরের এই নীরব ভাষা কি তোমার মনের অগোচর আছে? আর স্থির থাকতে না পেরে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তোমার কাছ থেকে কি এখনো কোন বাণী আসিবে না?

বিমলা

পত্রখানা শেষ করিয়া বিমল দুই তিন বার পড়িয়া দেখিল। পরে সেখানা একমনে খামে মুড়িতেছে, এমন সময় উজ্জল দীপালোকে সম্মুখে কাহার ছায়া পড়িল। চমকিত হইয়া বিমল মুখ তুলিয়া দেখিল—বিনয়কুমার!

অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া সে বলিয়া উঠিল—কখন এলে তুমি? তোমার ওখানকার কাজ সব শেষ হয়ে গেল?

বিনয়কুমার গম্ভীর ভাবে বলিলেন—প্রায় সবই শেষ হয়েছে। যে টুকু বাকি আছে, আজ রাত্রে সেটা শেষ হবে।

বিমল বলিল—খুনীর সন্ধান পেয়েছ ও? কে এ খুন করলে? সেই যোগেশটাই খুনী না কি?

"অত ব্যস্ত হয়ো না। আজ রাত্রে খুনীকে গ্রেপ্তার করবো স্থির করেছি। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

"কোথায় ?"

"১৪ নং বাড়ীতে—খুনীকে ধরতে।"

বিমলের মুখ শুকাইয়া গেল, সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

বিনয়কুমার বলিলেন—আজ রাত দশটার সময় এক জন ভদ্রলোক তোমার এখানে আসবেন। আমি তাঁকে এইখানকার ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি। যদি সে সময় আমি না থাকি, তুমি তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসিও। তিনি এক-জন এটর্ণী, প্রমথনাথ মিত্র।

বিমল অবাক নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিল।

বিনয়কুমার বলিতে লাগিলেন, আরো একজনের এখানে আসবার কথা আছে, তাঁকে হঠাৎ দেখলে যেন চমকে যেও না। সেই যে সেদিনের ভদ্রলোকটি—যোগেশচন্দ্র রায়!

বিমল অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে বলিল—ভাই বিমল! ব্যাপারটা কি সব খুলে বল—আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না।

বিনয় কুমার বলিলেন—আর একটু অপেক্ষা কর।

এতদিনের সব রহস্য আজ প্রকাশ হবে। তবে এখন আমি তোমাকে কোন কথা বলতে পারব না। যাঁদের আসবার কথা আছে, তাঁরা এলেই সমস্ত জানতে পারবে।

বিমল আর কিছু বলিল না, তাহার হৃদয় উদ্বেগে ও আশঙ্কায় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। ১৪ নং বাড়ীতে সেই মহিলাটি ভিন্ন আর যে কেহ বাস করে, এমন ত মনে হয় না। সে বাড়ীতে বিনয় কাহাকে ধরিতে যাইতেছে?

বিনয়কুমার একবার উঠিয়া গেলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরে বিমল দেখিল, চারজন কনষ্টেবল নিঃশব্দে আসিয়া ১৪ নম্বরের বাড়ীর চার পাশে লুকাইয়া রহিল। বিনয়কুমার ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের ধারে বসিলেন, ও অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে একখানা উপন্যাস লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

রাত্রি দশটা বাজিল। প্রমথবাবু অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

"এই যে বিনয় বাবু! আমি আপনার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে চলে এসেছি। মায়ার কোন সন্ধান করতে পেরেছেন কি? (এদিক ওদিক চাহিয়া) কিন্তু এখানে এসে দেখা করতে বলেছেন যে? এটা কার বাড়ী?"

বিনয়কুমার বলিলেন—আমার বন্ধু বিমলের বাড়ীতে আপনাকে অভ্যর্থনা করছি! প্রমথ বাবু! আপনি যাঁর

সন্ধান করবার ভার আমায় দিয়েছিলেন, তাঁর সংবাদ দেবার জন্যই আপনাকে এখানে ডেকেছি, কিন্তু সে সংবাদ সুখের নয়। আপনাকে দুঃসংবাদ শোনবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

প্রমথ বাবুর মুখ ম্লান হইয়া গেল, তিনি বলিলেন, কি দুঃসংবাদ বিনয়বাবু? মায়া কি তবে বেঁচে নেই?

যোগেশবাবু আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইলেন, বিনয়কুমারকে দেখিয়া বলিলেন—আপনার চিঠি পেয়ে আমি এখানে এসেছি। আমাকে কি আপনার কোন দরকার আছে?

বিনয়কুমার তাঁহাকে ঘরের ভিতর লইয়া আসিলেন; বলিলেন—আপনাদের দুজনকেই আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সেই জন্যই এখানে আসবার জন্য আপনাদের লিখেছিলুম। এখন আমার যা বলবার আছে, আমি বলে যাই—আপনারা শুনুন।—যার যা জিজ্ঞাস্য থাকে, সে বিষয় আমার কথা শেষ হয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করবেন।

বিনয়কুমার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

প্রায় একমাস আগে এখানকার একজন বিখ্যাত এটর্নী আমাকে একটি কাজের ভার দেন। নলডাঙ্গার জমীদার বাড়ীতে কোন পারিবারিক অশান্তির জন্য জমীদার পুত্র বাপের সঙ্গে বিবাদ করে বাড়ী থেকে

চলে যান। জমীদারও একান্ত বিরাগে পুত্রের কোনও খোঁজ নেন নি। জমীদার মৃত্যুকালে তাঁর বন্ধুকে বলে যান, তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। তার একটি কন্যা আছে সেই কন্যাকে খোঁজ করে এনে যেন সব বিষয় তাকেই দেওয়া হয়। এটর্নী সেই নিরুদ্দিষ্ট কন্যার সন্ধানের ভার আমাকে দেন। সনাক্ত করবার সুবিধা হবে ভেবে তিনি আমায় একখানি ছবিও দিয়েছিলেন। যোগেশ বাবু! এই ছবিখানি বোধ হয় আপনার অপরিচিত হবে না?

বিনয়কুমার একখানি ছবি যোগেশ বাবুর দিকে তুলিয়া ধরিলেন। যোগেশ বাবু একবার চাহিয়া দেখিয়াই মস্তক নত করিলেন। কোন কথা বলিলেন না।

বিনয়কুমার ছবিখানি বিমলের দিকে ধরিয়া বলিলেন তুমিও একবার এখানি দেখে রাখতে পার। এতদিন ধরে যাঁর পরিচয় পাবার জন্য তুমি ব্যগ্র হয়ে আছ, এখানি তাঁরি ছবি।

বিমল ছবিখানি লইয়া অপলক নেত্রে দেখিতে লাগিল। যোগেশ বাবু একবার বিমলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

বিনয়কুমার বলিতে লাগিলেন—আমি ভেবেছিলুম, দুই একদিনের মধ্যেই কাশী গিয়ে মেয়েটির সন্ধান করব—কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় নগেন

বাবু সুরি লেনে খুন হলেন। তদন্তের ভার আমার উপর পড়লো।

নগেন বাবুর বিষয় সন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল, খুনের আগের দিন যোগেশ বাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। উভয়ের মধ্যে কথায় কথায় বচসা হয়। যোগেশ বাবু তাঁকে মারবার ভয় দেখিয়ে চলে আসেন। মহেন্দ্রবাবু এই থেকেই যোগেশ বাবুকেই হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেন। আমিও তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বোধ করলুম।

ইতিমধ্যে আমি নগেন বাবুর কাগজপত্রের মধ্যে এই ছবি ও দুখানা চিঠি পেয়ে আমার পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত বদল করলুম। আমার বিশ্বাস হল—খুন যে করেছে সে পুরুষ নয়—স্ত্রীলোক!

বিমল ও প্রমথবাবু এক সময়ে সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিলেন—স্ত্রীলোক! কেবল যোগেশ বাবু নতমস্তকে নীরব হইয়া রহিলেন। বিনয়কুমার একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—হাঁ! সে স্ত্রীলোক! যা হোক, একদিন আমি সন্ধ্যার পর যোগেশ বাবুর অনুসরণ করে এসে দেখলুম, ১৪নং বাড়ীটার উপর তাঁর লক্ষ্য। আমি বিমলের কাছে আগেই শুনেছিলুম, ঐ বাড়ীতে একটি মহিলা গুপ্তভাবে

থাকেন—তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক। প্রথমে আমি এ কথায় বিশেষ মনোযোগ দিইনি। তবে যোগেশ বাবুকে এখানে আসতে দেখে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হল।

ভেবেছিলুম, আর দুই এক দিন তাঁর অনুসরণ করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার পরদিন যোগেশ বাবু গ্রেপ্তার হওয়ায় সব গোলমাল হয়ে গেল। মহেন্দ্র বাবু এমন সব প্রমাণ উপস্থিত করলেন, যে আমাকেও দোমনা হতে হলো। বড় সাহেবও স্পষ্ট করে মহেন্দ্র বাবুর পক্ষ সমর্থন করলেন। আমি দেখলুম, এমন ভাবে কাজ করলে আর চলবে না। আমি কাশী যাবার নাম করে অদৃশ্য হলুম।

কাশী যাবার আমার ইচ্ছা ছিল বটে, তবে এই ১৪ নম্বর বাড়ীর সন্ধান ভাল ভাবে না নিয়ে আমার যেতে ইচ্ছা হল না। আমি এই গলিটার ভিতর ঘুরে ঘুরে একটা লুকান জায়গার সন্ধান করতে লাগলুম। ঘটনা ক্রমে একখানা ঘর তখন খোলার বস্তিতে খালি ছিল—আমি সেইখানা ভাড়া নিয়ে এই বাড়ীটার উপর লক্ষ্য রাখলুম। ঠিকা ঝি আমার গুপ্তচর হল।

ঝিয়ের কাছে খবর পেলুম, বাড়ীতে মহিলাটি ভিন্ন আর কেউ নেই। তাঁকে সে কোন দিন দেখতে পায় না, নীচে থেকে কাজ কর্ম্ম করে চলে যাওয়াই তার প্রতি হুকুম

আছে। যদি কোন দিন বিশেষ কিছু প্রয়োজনে তিনি নীচে আসেন, তাঁর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একটা আলখাল্লা পরা থাকে। শুধু চোখের কাছে দুটি জাল। তাঁর হাত ও পায়ের রং খুব ফরসা; ডান হাতের উপর একটা তিন কোণা জড়ুল আছে।

আমি বুঝলুম, ঠিক জায়গাতেই এসেছি। কিন্তু খুনের এখনো কোন প্রমাণ পাই নি,—অপেক্ষা করতে লাগলুম।

তিনি প্রায়ই বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতেন না। তাই আমার দেরি হতে লাগলো। অবশেষে একদিন সন্ধ্যার সময় দেখি, দরজায় তালা বন্ধ। বুঝলুম, আজ তিনি বাড়ী নেই। তখনি বন্দুক ঠিক করে নিয়ে কাটা জানালা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লুম। উপরে দুটি মাত্র ঘর। দেখতে বিশেষ সময় লাগল না। আমার যা দরকার ছিল, সবই পেয়েছি। যে রকম গুলি নগেন বাবুর মাথা থেকে পাওয়া গিয়েছিল, সেই রকম গুলিভরা পিস্তল দেখেছি। এক কোণে একটা কালো ক্লোক পড়েছিল, কিন্তু আমি কোন জিনিসে হাত দিইনি।

আমি বড় সাহেবকে বলে যোগেশ বাবুকে মুক্তি দিয়ে এইখানে আসতে লিখে দিলুম। ঝির হাতে প্রমথ বাবুর জবানী একটা চিঠি ১৪ নম্বরে পাঠিয়েছি, যে তোমার

পিতামহর উইল অনুসারে তুমি তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। এতদিনে গোয়েন্দার সাহায্যে তোমার সন্ধান পেয়েছি। বুধবারে তোমার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত বিষয় জানাব।

আমি জানি, সে কখন আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না। আজ সোমবার—সে বুধবারের আগেই সরে যেতে পারে। সেই জন্য আজ রাতে আমরা তার সঙ্গে দেখা করব স্থির করেছি। ইচ্ছা থাকলেও সে পালাতে পারবে না। তার বাড়ীর চারদিকে পুলিশ মোতায়েন রেখেছি।

তিনজন শ্রোতা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। শেষে প্রমথ বাবু বলিলেন—বিনয় বাবু! মায়াই যে খুন করেছে, এমন কিছু চাক্ষুষ প্রমাণ ত আপনি পান নি!

তখন যোগেশ বাবু বলিলেন, আর যদিই সে এ খুন করে থাকে, তবে অতি বড় নির্য্যাতনের ফলেই করেছে। যে তাকে বিনা দোষে এত উৎপীড়ন করেছিল, সেই পাষণ্ডের পীড়ন মেনে নিতে পারেনি বলেই এই ঘটনা ঘটেছে। বিনয় বাবু, আপনি ভদ্রলোক, আপনার হৃদয়ে দয়া মায়া আছে, একবার বিষয়টা ভাল করে ভেবে দেখুন।

কেবল বিমল কোন কথা বলিতে পারিল না, সে শুধু উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বিনয়কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিনয়কুমার বলিলেন, আমি আপনাদের দুজনকেই বলছি, আমি ভদ্র মহিলার সম্মান রক্ষা করতে জানি। এ ব্যাপারে আমার নিজের যে কত বেদনা বোধ হচ্ছে, সে আপনারা জানেন না। আমি ত যেদিন এ সব প্রমাণ পেয়েছিলুম, সেই দিনই তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারতুম। তা না করে আপনাদের সবাইকে ডেকে এত কাণ্ড করবার আমার কি দরকার ছিল? মানুষ শুধু শুধু কারুকে খুন করে না, নিশ্চয়ই নগেন বাবু তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিল, সেইটা যে কি, তাই এখন আমাদের জানতে হবে। যোগেশ বাবু সবই জানেন. তিনি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারেন। তবে যদি এখনো তাঁর কোনও আপত্তি থাকে, তা হলে আমাকে এবার সত্যই কাশী যেতে হবে।

যোগেশ বাবু বলিলেন, আর আমার কোন কথা গোপন করবার দরকার নেই। যাকে নিরাপদে রাখতে আমি নীরব হয়ে ছিলুম, তার বিপক্ষে সব কথাই এখন আপনি জেনেছেন। আমার সমস্ত কথা আমি বলছি, আপনারা শুনুন—

"এখানকার ইউনিভারসিটি থেকে এম-এ পাশ করে যখন কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখছি, তখন কাশী থেকে এক বন্ধুর কাছে খবর পেলুম, হিন্দু কলেজে ইতিহাস পড়াবার জন্য তিনি আমার জন্য এক কাজের যোগাড় করেছেন। অতএব আমি যেন শীঘ্র চলে আসি।

আমি গিয়ে সেই কাজ গ্রহণ করলুম। দিনের বেলা কাজ থাকতো, বেড়াবার সুবিধা ছিল না। বৈকাল থেকে রাত আটটা নয়টা পর্য্যন্ত আমি নতুন জায়গা দেখবার কৌতূহলে কেবল পথে পথে ঘুরে বেড়াতুম। একদিন ঐ রকম ভাবে বেড়াতে বেড়াতে রাত অনেক বেশী হয়ে গিয়েছিল। সেদিন আমি বোধ হয় পথ হারিয়ে ফেলেছিলুম যে দিকেই যাই ঘুরে ঘুরে পরিচিত রাস্তা ধরতে কোনমতে পারছিলুম না। এ গলি ও গলি ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একটা অজানা পথে এসে পড়লুম। পথে লোক চলাচল তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি দেখলুম, সেই গলির একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর গায়ে খুব ছোট একটা দরজা—তার সামনে একজন লোক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমে ভাবলুম, তাকে পথটার কথা জিজ্ঞাসা করে নেব। খানিকটা এগিয়ে কিন্তু মনে একটা সন্দেহ হল। লোকটা কি মতলবে এই নির্জ্জন গলিতে এত রাত্রে ও রকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে? অনেক দূরে একটা আলো জ্বলছিল। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে তত বেশি আলো ছিল না। সেই আলো আঁধারের মধ্যে তাকে ঐ ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, আমি আর তার কাছে না গিয়ে, নিজেই এক দিকে এগিয়ে পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সেদিন যে কি গোল হয়েছিল, প্রায় আধ ঘণ্টা নানা দিকে ঘুরে আবার দেখি, সেই গলিটার মধ্যেই এসে পড়েছি। লোকটা তখনো সেইখানে তেমনি ভাবে দাঁড়িয়েছিল। আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম, এবার আর কিছু না ভেবেই তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। সে বোধ হয় এতক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করছিল। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই সে আমার মুখের দিকে চেয়ে অচঞ্চল স্বরে বল্লে—'মতিয়া'!

সে সময় কাশীর এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর কন্যা দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রে বিশ্বনাথের মন্দির থেকে অপহৃত হয়েছিল। খবরের কাগজে আমি প্রায়ই সেই চুরির বিষয় পড়তুম। সহরের সর্ব্বত্র লোকের মুখে মুখে এই কথার চর্চ্চা হতো।

গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ কর্ম্মচারীরা এই মেয়েটির সন্ধানে চারিদিকে ঘুরছিল। মেয়েটির নাম মতিয়া।

যার সন্ধানে ও যার কথায় সমস্ত কাশী সহর তোলপাড় হচ্ছে, অকস্মাৎ এই গভীর রাত্রে ওই লোকটার মুখে তার নাম শুনে আমি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। তার পরেই মনে হলো, মতিয়া হয় ত এই বাড়ীটায় বন্দিনী হয়ে আছে। লোকটা হয়ত কোন রকমে তার সন্ধান পেয়েছে। তাকে উদ্ধার করবার জন্য সে হয় ত আমার সাহায্য চায়। আমি এই সব ভেবে থমকে দাঁড়াতেই সে দরজা খুলে দাঁড়াল, তার পর সে তার ঠোঁটের উপর হাত রেখে আমায় নিঃশব্দ থাকতে বলে আমায় ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করলে।

আমি মন্ত্র চালিতের মত নীরবে তার অনুসরণ করলুম। কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি, কিছুই আমার মনে হলো না। আমার সেই অদ্ভুত সঙ্গীর পিছনে আমি দুই তিনটা হল পার হয়ে সিঁড়ীতে উঠলুম। দোতলার উপরে উঠে একটা বন্ধ দরজার কাছে এসে সেই লোকটা একটু থমকে দাঁড়াল। তার পর নিঃশব্দে দরজাটা খুলে আমায় ভিতরে ঠেলে দিলে।

আমি অবাক হয়ে দেখলুম, একটা প্রকাণ্ড হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি! চারিদিকের উজ্জল আলোয় আমার চোখে

যেন ধাঁধা লেগে গেল। হলের মধ্যে ঢালা পরিষ্কার বিছানা পাতা, জায়গায় জায়গায় এক এক দল লোক বসে-আছে। তাদের চেহারা ও বেশভূষা দেখে সকলকেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশের বলে মনে হল। সেই হলেই আমি সর্ব্ব প্রথম প্রভাতের শুক তারার মত জ্যোতির্ম্ময়ী মায়াকে দেখলুম! সে তখন এক পাশে দাঁড়িয়ে নগেন বাবুর সঙ্গে গল্প করছিল! বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত কেটে গেলে, আমার বোধ হল, আমি একটা বিরাট জুয়ার আড্ডায় এসে পড়েছি।

এদিকে হঠাৎ আমাকে ঘরে ঢুকে হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, সকলেই খেলা ফেলে আমার দিকে চেয়ে দেখলে! তার পরই একটা তুমুল সোরগোল বেধে উঠ্‌লো!

. সেই সব গোলমালের ভিতর থেকে কোথা হতে একটা ডুসমন চেহারার লোক এসে বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত চেপে ধরলে! বল্লে, কে তুই? এখানে কেমন করে তুই এলি?

তার পরই সে বিকট চীৎকার করে হাঁক দিলে 'নন্‌কু!'

আমি দেখলুম, গলিতে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল, সে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল!

ষণ্ডা লোকটা হুঙ্কার করে বল্লে, এই শয়তানের বাচ্চা এখানে কেমন করে এল?

নন্‌কু বল্লে,—এই লোকটা কেবলি আমাদের গলির মধ্যে ঘুরছিল। অনেকক্ষণ দেখে দেখে আমি ভাবলুম, দলের কোন নতুন লোক বোধ হয় পথ ভুলে গেছে। তার পরই লোকটা আমার কাছে আস্‌তে, আমি আমাদের আজকার সঙ্কেত কথা উচ্চারণ কল্লুম। তখনি ও থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। দলের লোক ভেবে আমি তখন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম।

ষণ্ডা গর্জ্জন করে বল্লে—তোমার এসব বিষয়ে আরও বেশি সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এ ব্যাটা পুলিশের গুপ্ত-চর, আমাদের আড্ডার সন্ধান নিতে এসেছে! যা হোক্, আমি ওকে ঠিকানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি—ফিরে গিয়ে ওকে আর খবর দিতে হবে না!

চোখের নিমেষে কোমরের ভিতর থেকে সে একটা শাণিত ছোরা বার করলে!

এতক্ষণ ভয়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল! এখন প্রাণের মায়ায় অকস্মাৎ আমার কথা বলবার শক্তি ফিরে এল!

আমি চীৎকার করে বলে উঠলুম,—আমি পুলিশের চর নই! আমি পথিক! পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছিলুম!

ষণ্ডা লোকটা হা-হা করে বিকট হাসি হেসে উঠলো!

বল্লে—আচ্ছা ! আচ্ছা ! তোকে ঠিক পথ দেখিয়ে দেওয়া যাচ্ছে ! চোখ বুঁজে ঠিকানায় চলে যাবি ! কোন ভাবনা নেই !

তার পরই সে সেই ছোরা খানা মাথার উপর তুলে ধরলে। ঘরশুদ্ধ লোক নির্নিমেষে চেয়ে রইলো। আমি ভয়ে চোখ বুঁজলুম।

অকস্মাৎ তার উদ্যত হস্ত থেমে গেল। এক অপূর্ব্ব তীব্র মধুর স্বরে কে বলে উঠলো,—খবরদার ! সর্দ্দার ! হাত নামিয়ে নাও বলছি !

চোখ চেয়ে দেখি মায়া লাফিয়ে এসে সর্দ্দারের হাত চেপে ধরেছে। তার জ্যোতির্ম্ময় চোখ দুটি থেকে তখন আগুনের শিখা বেরোচ্ছিল।

সর্দ্দার এ রকম বাধা পেয়ে রাগে ফুঁসতে লাগলো। দাঁতের উপর দাঁত চেপে সে বল্লে,—জানো ! এ লোক বাইরে বেরোতে পেলে আমাদের সকলকে ফাঁসীতে ঝুলতে হবে ? সেদিন এখানে যে খুনটা হয়েছে, তার 'পর থেকে পুলিশে এই আড্ডা খুঁজে বের করবার জন্য সহর তোলপাড় করেছে। ও আমাদের বিষম শত্রু—টিকটিকি পুলিশের লোক !

মায়া বল্লে,—ফাঁসীতে ঝুলতে তোমাদের আজ না হলেও

আর এক দিন হবেই! সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক! কিন্তু উনি কখন পুলিশের লোক নন! তোমরা মুখ দেখে মানুষ চিনতে পার না? উনি নিরীহ পথিক—পথ ভুলে তোমাদের গোলকধাঁধায় এসে পড়েছেন।

ঘরের সকলে এতক্ষণ চুপ করে ব্যাপার দেখছিল, এখন তারা অত্যন্ত কোলাহল আরম্ভ করলে। সকলেই বলতে লাগলো, ও পথিক হলেও ওকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ও যখন এখানকার ব্যাপার সব দেখে গেল, তখন এ সব কি আর বাইরে অপ্রকাশ থাকবে?

মায়া তখন তার সেই অপূর্ব্ব সুন্দর কালো চোখ দুটি আমার দিকে ফিরিয়ে বল্লে, আপনি নিশ্চয় এখানে যা দেখে গেলেন, কোথাও প্রকাশ করবেন না?

আমি তখনি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলুম—কখন না—প্রাণ থাকতে কারুর কাছে কোন কথা প্রকাশ করবো না।

সর্দ্দার কিন্তু তখনো আমাকে ছাড়তে যায় না। সে ভীষণ মুখভঙ্গী করে একটা কটূক্তি করে বল্লে—ও…কথায় বিশ্বাস কি? দায়ে পড়লে অমন অনেক…ই বাবা বলে!

মায়া ঘোর অশ্রদ্ধার সহিত বল্লে—নিজেদের দিয়ে জগতকে বিচার করো না! উনি ভদ্রলোক—ওঁর মুখের প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট বলে তোমরা মেনে নিতে পার! তোমরা

নিশ্চিন্ত থাক—ওঁর দ্বারা তোমাদের এ সব শয়তানী কখন প্রকাশ পাবে না।

সে এসে অসঙ্কোচে আমার হাত ধরলে। বল্লে আসুন! আপনাকে আমি এই গলিটা পার করে বড় রাস্তায় রেখে আসি! ঘরশুদ্ধ লোক রাগে রুদ্ধবাক্ হয়ে হিংস্রনয়নে চেয়ে রইলো! আমরা দুজনে হল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়ালুম।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে যে সব ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেল, তাতে উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় আমার শরীর মন অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। আমি কোন কথা বলতে পারি নি, সেও নিঃশব্দে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

বড় রাস্তার উপর এসে সে আমায় বল্লে,—এবার বোধ হয় আপনি পথ চিনে যেতে পারবেন?

আমি অভিভূতের মত যাচ্ছিলুম, তার কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙলো। আমি চারিদিক চেয়ে বল্লুম—হ্যাঁ। এখান থেকে আমি বেশ যেতে পারবো। কিন্তু আপনাকে ত ওরা কোন নির্য্যাতন করবে না?

সে তাচ্ছিল্য ভরে বল্লে—কিছু না—আমার সঙ্গে লাগবার সাহস ওদের নেই। ওদের আমি কিছুমাত্র ভয় করি না! আচ্ছা—এখন তবে আমি চল্লুম।

সে ফিরে দাঁড়াল। আমি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলুম—আপনার সঙ্গে আর কি কখনো দেখা হবে না? আজ আপনি আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন সে কথা—

সে বাধা দিয়ে বল্লে—ও সব কথা বলবেন না, ওর কোন দরকার নেই। তবে দেখা?—আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, ত কাল বিকালে দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে থাকবেন।

দেখতে দেখতে লঘু ক্ষিপ্রগতিতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি নিস্পন্দের মত কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। বীণার ঝঙ্কারের মত তার মধুর স্বর তখনো আমার কাণে বাজতে লাগলো।

সে রাত ও তার পরের দিনটা যে আমার কি করে কেটেছিল, সে আমি আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না। বিকেলে দশাশ্বমেধ ঘাটের এক নিভৃত প্রান্তে আবার তার সঙ্গে আমার দেখা হলো।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যোগেশ বাবু কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

"যদি এইখানেই আমাদের সম্বন্ধের শেষ হতো, তা হলে হয় ত আজকার এই ভীষণ ঘটনা ঘটতো না।

কিন্তু মানুষ নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে চলতে গিয়ে কখন

যে নিজেরও অজ্ঞাতে কোন্ অগ্ন্যুৎপাতের সূচনা করে রাখে, তা সে কল্পনাও করতে পারে না।

সেদিন তার মুখে তার জীবনের সব ইতিহাস শুনলুম; দেখলুম, সে অন্তরে বাহিরে সমান সুন্দর। তার মনের মধ্যে কোথাও একটু কপটতা নেই। সামান্য একদিনের পরিচয়েই সে শিশুর মত অসঙ্কোচে তার নিজের সব কথা বলে গেল।

সর্দ্দার ওরফে গণেশ বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে তার মা ভাড়াটিয়া ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে অনাথিনী মায়াকে সর্দ্দারই মানুষ করেছিল। গণেশ একটি বিখ্যাত গুণ্ডার সর্দ্দার,—গুণ্ডামী করা—যাত্রীদের ঘর ভাড়া দিয়ে পরে সুবিধা বুঝে তাদের সর্ব্বনাশ করা ইত্যাদি নানা 'সাধু' উপায়ে সে জীবিকা নির্ব্বাহ করতো। কিন্তু সব চেয়ে তার প্রধান ব্যবসা ছিল—বড় বড় জুয়ার আড্ডা পরিচালন করা—এই সব আড্ডায় যে প্রতিদিন কত বীভৎস কাণ্ড ঘটতো—তার ইয়ত্তা ছিল না। এই সব আড্ডা চালাবার প্রধান কর্ত্তৃত্ব ভার ছিল মায়ার উপর। এ সব কথা সংক্ষেপে বলাই ভাল। প্রধানতঃ মায়ার আকর্ষণেই অনেক সম্ভ্রান্ত ধনীসন্তান এই আড্ডার দলভুক্ত হয়।

এ সব আড্ডায় জুয়াখেলা ছাড়া রাহাজানি খুন খারাপি

কিছুই বাদ পড়তো না। মায়া এই সব দলে ছোট বেলা থেকে প্রতিপালিত হয়ে অসীম সাহসী ও দুর্দ্ধর্ষপ্রকৃতি হয়ে উঠেছিল। সে এই সব দলের প্রধান অভিনেত্রী ছিল, আর সব গুপ্তকথাই তার জানা ছিল বলে সকলেই তাকে বিশেষ ভয় করে চলতো। তা ছাড়া সর্দ্দার তাকে ছোট বেলা থেকে মানুষ করেছিল বলে ভালও বাসতো।

২১

গঙ্গার মৃদু জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে তার মধুর স্বর মিশে যেন একটা অপূর্ব্ব রাগিনীর মত আমার কাণে বাজছিল। আত্মহারা হয়ে তার গলা শুনতে শুনতে কখন যে গভীর রাত হয়ে গেছে বুঝতেও পারি নি।

গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারটা বাজলো। সে সেই শব্দে চকিত হয়ে উঠে পড়লো। বল্লে, রাত অনেক হয়ে গেছে, আজ উঠি—কাল আমি আবার আসবো।

তাকে দেখে পর্য্যন্ত আমার প্রধান সঙ্কল্প হলো, এই সব কুৎসিত দল থেকে তাকে উদ্ধার করা। কণ্ঠে যার মধু ক্ষরণ হয়, বীর্য্যে ও লাবণ্যে অনুপম এই নারী যে এই হীন সংসর্গে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এ চিন্তা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠলো।

প্রতিদিন বৈকালে তার সঙ্গে আমার দেখা হতো। আমি দেখলুম, হীন সংসর্গে থাকিলেও এদের কলঙ্ক-কালিমা তার অন্তরের শুভ্রতাকে মলিন করতে পারে নি। অন্তরে সে তখনো একটি মহিলা। তার মনের সুকুমার প্রবৃত্তি-গুলি তখনো নষ্ট হয় নি। হয় ত সে এদের সংসর্গে মন থেকে তৃপ্তি পেত না, তাই আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই সে একান্ত আগ্রহে আমাকেই তার বন্ধু বলে গ্রহণ করলে।

ধীরে ধীরে গল্পের সঙ্গে তার কাছে অনেক ভাল বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করলুম। কত দেশ বিদেশের কথা, ইতিহাসের কথা, স্বাধীনতার কথা. দেশের জন্য ধর্ম্মের জন্য যাঁরা আত্মোৎসর্গ করে গেছেন তাঁদের জীবনের সুমহান্ ত্যাগ, তাঁদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কথা গল্প করতে লাগলুম: মায়া এ সব কথা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনতো। আমি যখন তাকে এ সব বিষয় বই পড়ে শোনাতুম, বা মুখে বলতুম, তার নিশ্বাস জোরে বইত, তার জ্যোতির্ম্ময় চোখ দুটি দীপ্ত হয়ে উঠতো। এমনি করে তার এতদিনের সুপ্ত মনোবৃত্তির বিকাশ হতে লাগলো।

ক্রমে মায়া তাদের আড্ডায় যাওয়া আসা ত্যাগ করলে। দলের লোকের সংসর্গ একেবারে ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন বাড়ীতে

থাকতে আরম্ভ করলে। সর্দ্দার ও আর সকলে আমার উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু সব চেয়ে আমার উপর আক্রোশ বেশি হল নগেন বাবুর। মায়ার আকর্ষণেই সে এই দলে এসে জুটেছিল, এখন আমার সঙ্গে তার অতিমাত্র বন্ধুত্ব দেখে রাগে ও হিংসায় সে জ্বলতে লাগলো।

এদিকে আমার অবস্থাও ক্রমে শোচনীয় হয়ে আসছিল। মায়া আমার সমস্ত মন এমন অধিকার করে বসেছিল যে, আমি তাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত কোথাও থাকতে পারতুম না। কলেজ থেকে ফিরেই তার কাছে ছুটে আসতুম, তার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত, রাত গভীর হয়ে আসত, আমার আর সময়ের জ্ঞান থাকতো না।

একদিন অবশেষে তাকে সব কথা খুলে বল্লুম। জ্যোছ্‌-নার আলোয় তখন চারদিক ভাসছিল, ছাতের উপর আমরা দুজনে বসে ছিলুম। সমস্ত সহর যেন তখন সুধা সাগরে ডুবে ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল মাথার উপর শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ ও তারাদল নিঃশব্দে আমাদের দিকে চেয়ে ছিল।

সে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল; তার পর বল্লে,—তুমি এই কথা বলছো; আমার বিষয় সব জেনে শুনেও?

আমি স্থিরভাবে বল্লুম,—হ্যাঁ! সব জেনে শুনেই বলছি।

সে আবার ভাবতে লাগলো, তার পর বল্লে, যোগেশদা! তোমার মহত্বে সবই সম্ভব হতে পারে; কিন্তু আমি এতে মত দিতে পারবো না। আমার চেয়ে অনেক উচ্চে তুমি আছ, মোহে পড়ে সেখান থেকে তোমায় নীচে নামতে দেব না। তুমি আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করে আমায় নব জীবনের পথ দেখিয়েছ! আমার গুরু তুমি! সংসারে আমার কেউ নেই, অসহায়ের চিরদিনের সহায় হয়ে তুমি থাক—আমি এই মাত্র চাই!

সে উঠে এসে আমায় পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলে। বল্লে—আমার এবারকার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে! কোনও একটা ভাল কাজে আমি এ জীবন উৎসর্গ করবো। আমার বড় ভাই তুমি—দাদার মত হাত ধরে আমায় সত্যের পথে নিয়ে চল। যদি তোমায় ব্যথা দিয়ে থাকি, অপরাধ নিয়ো না, আমায় মাপ করো! ঝরঝর করে তার চোখের জল আমার হাতের উপর ঝরে পড়তে লাগলো।

আমার এতদিনের সুখের স্বপ্ন এক নিমেষে ভেঙ্গে গেল! আমি আঘাত পেলুম, তবু নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে তাকে বল্লুম, তাই হবে! তুমি আমায় যে ভাবে গ্রহণ করবে, আমি সেই ভাবে তোমার কাছে নিজেকে দিতে প্রস্তুত আছি।

আমাদের দিন এক রকম সুখেই কাটছিল। আমি যে ভাবে তাকে চেয়েছিলুম, সে ভাবে না পেলেও সে ত একান্ত মনে আমাকেই তার আশ্রয় ও নির্ভর বলে অবলম্বন করেছিল। প্রথম আঘাত সয়ে যাবার পর আমারও আর বিশেষ কিছু ক্ষোভ ছিল না।

কিন্তু নগেন দিন দিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। সে মায়াকে চায়, কিন্তু মায়া তাকে স্পষ্টই বলেছিল, সে ও পথে আর যাবে না। আমার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ, তাও সে নগেনকে বলেছিল, কিন্তু সে কথা সে বিশ্বাস করে নি।

অবশেষে তার উৎপাত অসহ্য হয়ে উঠ্‌তে, মায়া তার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করলে। সে তখন আরও মরিয়া হয়ে উঠল। দেখা করতে না পেরে সে চিঠি দিয়ে মায়াকে শাসাত যে তার কথামত কাজ না হলে, সে আমাকে ও মায়াকে খুন করবে।

আমি প্রতিদিনই তার এই রকম উৎপাতের কথা মায়ার কাছে শুনতে পেতুম। আমার ইচ্ছা ছিল, তাকে পুলিশের হাতে দিই। কিন্তু মায়া বল্লে, সে তাদের আড্ডার সকল কথাই জানে। তাকে পুলিশের হাতে দিলে সর্দ্দার বা মায়া নিজে কেউ নিরাপদে থাকবে না।

কিন্তু নগেনের উৎপাত দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠলো।

একদিন বিকেলে মায়ার কাছে শুনলুম, নগেন দুপুর বেলা জোর করে বাড়ী ঢুকেছিল। সে আজ শেষ কথা বলে গেছে, আমাদের দুজনকেই খুন না করে সে নিরস্ত হবে না।

আমি বল্লুম,—আজ থেকে না হয় আমি এখানেই রাত্রে থাকব। তুমি ত একলা থাক, একটা ঝি নিয়ে,—যদি সত্যই কোন দিন রাত্রে এসে উৎপাত করে?

মায়া হেসে বল্লে,—আমার উপর উৎপাত করতে সে সাহস করবে না, মুখে সে যতই আস্ফালন করুক। তবে তোমার জন্য আমার সত্যই ভয় হয়! তুমি নিজে একটু সাবধানে থেক!

দুদিন পরে একদিন রাত্রে বাড়ী এসে খেয়ে দেয়ে শুয়েছি। সবে একটু ঘুম আসছে, এমন সময় আমার বেহারা এসে আমায় জাগালে।

সে চুপি চুপি বল্লে—বাবু! সেই নগেন বাবু দুটো যণ্ডা দুষমন্ চেহারার লোকের সঙ্গে মায়া দিদিমণির বাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে কি ফিসফিস করে পরামর্শ করছে! আমি পান কিনতে গিয়ে দেখে এলুম!

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার বুক কেঁপে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে লাঠিটা নিয়ে মায়ার বাড়ীর দিকে প্রাণপণে ছুটলুম। বেহারাও আমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো।

মায়া হয় ত কিছুই জানে না, ঘুমিয়ে আছে! পাষণ্ড না জানি এতক্ষণ কি সর্ব্বনাশ বাধিয়েছে!

গিয়ে দেখি, সদর দরজা খোলা। পাগলের মত উপরে ছুটে যাচ্ছি, হঠাৎ মাথায় পিছন থেকে প্রচণ্ড লাঠির আঘাত পড়লো। আমি তখনি সেইখানে পড়ে গেলুম। জ্ঞান লোপ পাবার আগে ক্ষীণ ভাবে নগেনের স্বর আমার কাণে এলো। সে বলছে—এটাকে আর খুঁজে-পেতে মারতে হল না! ভালই হয়েছে। কিন্তু ছুঁড়িটাকে প্রাণে মারা হবে না! চল! এইবার উপরে গিয়ে দেখা যাক্!

যখন জ্ঞান হলো, দেখলুম, আমার বাসায় শুয়ে আছি। মাথার কাছে আমার বেহারা বসে আছে। আমি ডাকলুম, মায়া! কেউ সাড়া দিলে না। বেহারা বল্লে, সে এসে মায়াকে দেখতে পায় নি।

আমার মাথায় অত্যন্ত আঘাত লেগেছিল। সারতে এক মাস কেটে গেল। মায়ার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলুম, কিন্তু তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেরে উঠে নগেনের খোঁজ করতে গিয়ে দেখি, সেও কাশী ছেড়ে পালিয়েছে। আমি শুনেছিলুম, কলিকাতায় সুরী লেনে তার বাড়ী। তাকে ধরলে যদি মায়ার সন্ধান পাই, ভেবে চলে এলুম।

সে ত আমার সঙ্গে দেখাই করতে চায় না। অনেক জোর জবরদস্তি করে দেখা যদি বা হল, সে সমস্ত কথা একবারে অস্বীকার করে বসলো। ক্রমান্বয়ে বাদানুবাদে শেষে আমার রাগ চড়ে গেল। আমি তাকে বলে এলুম, যদি কাল পর্য্যন্ত সে কোন খবর না দেয়, তা হলে আমি তার যথাযথ বিহিত করবো।

তার পরদিন বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত আমি তার অপেক্ষা করলুম। সে এলো না। আমি আর একবার তার সঙ্গে দেখা করে শেষ চেষ্টা করব ভেবে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম। আজও যদি সে কোন খবর না দেয়, তা হলে আমার খুন করবার চেষ্টা ও মায়াকে গুম করবার দাবী দিয়ে তাকে পুলিশের হাতে দেব, এই আমার সংকল্প ছিল।

তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখা পেলুম না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলুম। শেষ বিরক্ত হয়ে যখন চলে আসছি, সেই সময় দূর থেকে যেন সে আসছে মনে হল। তাকে দেখে আমি আর না এগিয়ে সেইখানে দাঁড়ালুম! সে আর একটু এগিয়ে এলেই আমার সঙ্গে তার দেখা হবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘোর হয়ে এসেছে। সে প্রায় আমার কাছাকাছি এসেছে, হঠাৎ পাশের সরু গলির ভিতর

থেকে কালো কাপড় পরা কে-একজন তীরের মত ছুটে এসে তার সামনে দাঁড়াল। তখনি আমি বন্দুকের শব্দ শুনতে পেলুম।

নগেন বোধ হয় অস্পষ্ট আলোয় তাকে চিনতে পেরেছিল। সে একটা গুলি খেয়ে ও দুপা পিছিয়ে এসে বল্লে—কে—মায়া?

মুহূর্ত্তের মধ্যে দ্বিতীয় গুলি তার কপালে এসে লাগতেই সে হুমড়ি খেয়ে আমার গায়ের উপর পড়লো। তার গায়ের রক্ত আমার গায়ের কাপড়চোপড়ে লেগে গেল।

আমি প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু নগেনের মুখে অস্পষ্ট স্বরে যে নাম উচ্চারিত হল, সেটা আমার কাণে যেতেই। আমার লুপ্ত শক্তি যেন ফিরে এল।

চেয়ে দেখলুম, যে গলির ভিতর থেকে ছুটে এসেছিল, দ্বিতীয়বার গুলি করেই সে বিদ্যুতের মত সেই অন্ধকার গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি আর কোন দিকে না চেয়ে পাগলের মত রুদ্ধশ্বাসে তার পিছনে ছুটলুম।

বলতে যতটা সময় গেল, কাজে তার কিছুই লাগে নি। চক্ষের পলক পড়তে না পড়তে এত কাণ্ড নিমেষে ঘটে গেল।

আমি প্রাণপণে তাকে অনুসরণ করে ছুটলুম। জুতো পরে ছুটলে শব্দ হবে বলে জুতোটা এক জায়গায় খুলে ফেলে দিলুম। সে সময় আমার জ্ঞান ছিল না। আমায় এ ভাবে ছুটতে দেখ্‌লে লোকে কি ভাববে, কেউ আমায় লক্ষ্য করছে কি না, এ সব ভাবনা ভাববার আমার তখন অবসর ছিল না। তাকে এক মাস হারিয়ে আমার মন একবারে বিপর্য্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। যেমন করে পারি, তাকে অনুসরণ করে ধরতেই হবে, এইটাই তখন আমার একমাত্র চিন্তা ছিল।

আমার একান্ত পরিচিত সেই ক্ষিপ্রগতির অনুসরণ করে আমি এই গলিতে পর্য্যন্ত এসেছিলুম। এই বাড়ীটার কাছে আসতেই আমার পায়ে কি একটা লাগায় আমি একবার পড়ে গেলুম।

আবার উঠে দাঁড়াতে আমার পলকের বেশি সময় লাগে নি। কিন্তু আমি উঠে আর তাকে দেখতে পেলুম না। এইটুকু সময়ের মধ্যে আমি আবার তাকে হারিয়ে ফেললুম!

আমার মনে হল, সে এ গলি ছেড়ে আর কোথাও যায় নি, নিশ্চয়ই সে এইখানকার কোন বাড়ীতে ঢুকেছে।

অত্যন্ত নিরাশচিত্তে ও উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে সে রাত্রে আমি বাড়ী ফিরে গেলুম। স্থির করলুম—পরদিন ভোরে এই গলিতে এসে তার সন্ধান করবো।

কিন্তু সকালে এসে বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারলুম না। দেখলুম গলিতে সবই খোলার বস্তি, পাকা বাড়ি দুখানি আছে,—একবাড়ীটায় তার আসা অসম্ভব। তখন আমার অত্যন্ত সন্দেহ হল, সে নিশ্চয়ই এই পাশের ছোট বাড়ীটায় আছে। সেদিন সারাক্ষণ এই গলি ও বাড়ীটার চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু তার কোন সন্ধান পেলুম না। ভাল করে না জেনেও বাড়ীতে ঢুকতে পারি না, তাই যদি দরজায় বা উপরের জানালায় কোথাও তাকে দেখতে পাই বা বাড়ীর কোন লোক যদি বাইরে আসে এই আশায় অনেক ঘুরলুম, কোন ফল হল না। সমস্ত দিনের মধ্যে কেউ বাড়ীর বার হল না—দরজা জানালা সব বন্ধ।

ক্ষুণ্ণমনে সেদিন আমি ফিরে গেলুম। তার পর দিন সন্ধ্যায় আমি আবার এসেছিলুম, বিনয় বাবু জানেন। সেদিনও ব্যর্থ মন নিয়ে আমি ফিরে যাই। পরদিন সকালে মহেন্দ্রবাবু আমায় গ্রেপ্তার করলেন। সেদিনের সেই রক্ত-মাখা কাপড়গুলো সব আমার ঘর থেকে বেরোতে

চারিদিকে হুলস্থূল পড়ে গেল। সকলেই আমায় হত্যাকারী বলে জানলেন।

আমি দেখলুম, মায়া এতে নিরাপদ হতে পারবে। আমার কোন কথা না বলাই ভাল। পরের ব্যাপার সবই আপনারা জানেন।"

যোগেশ বাবুর সুদীর্ঘ কাহিনী শেষ হইল। বিনয়কুমার বলিলেন—এইবার এ গল্পের যে অংশটুকু অবশিষ্ট রহিল, সেটুকু তিনিই পূরণ করে দিবেন। রাত প্রায় বারোটা বাজতে যায়, আর আমাদের দেরি করবার দরকার নেই। আপনারা উঠে পড়ুন—বিমল! তুমিও ওঠো!

সকলে নিঃশব্দে আসিয়া ১৪ নম্বর বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইলেন। চারজন কনষ্টেবল বাড়ীর চারিদিকে লুকাইয়া ছিল। বিনয়কুমার একবার তাহাদের নিকটে গিয়া কি উপদেশ দিয়া আসিলেন।

বিনয়কুমারের শিক্ষামত ঝি বাহিরের ঘরের কাটা জানালা ভেজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল। নিঃশব্দে সেই জানালা খুলিয়া বিনয়কুমার ভিতরে লাফাইয়া পড়িলেন। তাহার পর তিনি সদর দরজা খুলিয়া দিলে প্রমথ বাবু, যোগেশ ও বিমল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চার জনে নিঃশব্দ পদে সিঁড়ী বাহিয়া উপরে উঠিতে

লাগিলেন। একটা ঘরে তখনো আলো জ্বলিতেছিল। সেই ঘরে বিছানার উপর বসিয়া এক রমণী কি পড়িতেছিল। বিনয়কুমারকে দেখিয়াই সে বাঘিনীর মত লাফ দিয়া পিস্তল হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘোর বিস্ময়সূচক চীৎকার করিয়া বিনয়কুমার কয়েক পদ পিছাইয়া আসিলেন। এ কি বীভৎস কদাকার মুখ! এই কি সেই শুকতারার মত তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী মায়া? এ কাহার সন্ধানে কোথায় আসিয়া পড়িলেন?

সেই ভয়াবহ বিকট মুখের দিকে চাহিয়া সকলেই বজ্রাহতের মত নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সেই সময় সেই রমণীর দৃষ্টি বিমলের বিবর্ণ স্তম্ভিত মুখের উপর পড়িল।

সেই মুহূর্ত্তে একটা হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ করিয়া ছিন্নমূল লতিকার মত সেই নারী সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

১২

নিস্তব্ধ রজনীতে, উজ্জ্বল দীপালোকে, সংজ্ঞাহীনা রমণীর দেহের নিকটে তাঁহারা চারিজনে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই অভাবনীয় ব্যাপারে তাঁহাদেরও চিন্তাশক্তি ক্ষণেকের মত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল!

কিছুক্ষণ পরে বিনয়কুমার প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই অচৈতন্য দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—এঁর মৃত্যু হয়েছে!

তখন প্রমথ বাবু বলিলেন—বিনয় বাবু! এই কি আমাদের মায়া?

বিনয়কুমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া যোগেশ বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন।

যোগেশ বাবু বলিলেন—এই মায়া! দেখছেন না—কেন সে নিজেকে এমন করে গোপন করে রেখেছিল? পাষণ্ড নগেন কোন তীব্র অ্যাসিড্ দিয়ে তার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল।

আবার সকলে সেই মৃতা নারীর কদাকার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুঠাম দেহ-লতার উপর সেই অর্দ্ধদগ্ধ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মুখ যে কি ভয়ানক দেখাইতেছিল, তা বর্ণনা করা যায় না। কালো চামড়ার

স্থানে স্থানে সাদা রং থাকায় সে.যেন আরও ভয়াবহ ও কুৎসিত দেখাইতেছিল।

বিনয়কুমার বলিলেন—১৪-নং বাড়ীর রহস্য এতদিনে সমস্ত প্রকাশ হল। কিন্তু এঁর এমন ভাবে হঠাৎ মৃত্যুর কারণ কি? বিছানার উপর একটা খাতা পড়ে রয়েছে, বোধ হয় ইনি কিছু লিখে রেখে গিয়ে থাকবেন। এই লেখা থেকে হয় ত আমরা অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় জানতে পারবো। আপনারা সকলে শুনুন—আমি এটা পড়ি—

"সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে ক্রমে নেমে আসছে। মহানগরীর সৌধমালার উচ্চ চূড়ার উপর দিয়ে—ঐ দূর বাগানের তাল ও নারিকেল গাছের মাথার উপর দিয়ে সুনিবিড় অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে চারিদিক ছেয়ে ফেলছে! এ যেন আমারি আঁধার জীবনের কালো ছায়া!

জীবনটা যেন আমার একটা গভীর দুঃস্বপ্নের মত, নিজের কথা ভাবতে গেলেই, গভীর অন্ধকার সাগরে উষার আলোর মত, আমার মায়ের পবিত্র সুন্দর মুখ একটি জ্যোতির রেখার মত ফুটে ওঠে! আমার দুঃখিনী সতী সাধ্বী মা! জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত আমি কখন তাঁর মুখে হাসি দেখিনি, তবু এত শোক দুঃখ এত অভাবের সঙ্গে যুঝেও সে মুখে কি তেজ কি পবিত্রতা! অতি বড় হৃদয়হীনও

কখন তাঁর মুখের দিকে চাইতে সাহস করতো না! নিজের এই চরম দুর্গতির দিনে তাই তাঁর কথাই থেকে থেকে মনে পড়ে।

সংসারে আমার সেই শেষ আশ্রয়ও যখন ভেঙে গেল, তখন সর্দার আমায় আশ্রয় দিয়েছিল! জীবনের প্রতি গভীর ধিক্কারে আজ যে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে যাচ্ছি, সেদিন যদি সেই মৃত্যু আসতো; সেই আশ্রয়ের ফলে আজ আমার এই অবস্থা! এক একবার মনে হয়, সর্দারের বুকে ছুরি বসাতে পারলে বুঝি আমার এ দুর্নিবার জ্বালার কথঞ্চিৎ অবসান হয়।

পেয়েছি! আজ ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন সন্ধানের ফলে সেই পাষণ্ডের দেখা পেয়েছি! কাপুরুষ, পিশাচ, আমার সামনে দাঁড়াবার সাহস ছিল না, তাই ঘুমন্ত অবস্থায় কতকগুলো গুণ্ডাকে নিয়ে আমায় আক্রমণ করেছিল, সেদিনের কথা কি কোন দিন ভুলতে পারবো! নিশুতি রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে আমি একবার চোখ চেয়েই তাকে দেখেছিলুম, তখনি ওঠবার চেষ্টা করেছিলুম, তারা তিন জনে আমায় চেপে ধরে মুখের উপর ক্লোরোফরম সিক্ত রুমাল চাপা দিলে! সেই মুহূর্তে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

যখন জ্ঞান হলো, দেখলুম, জীবনে আমি আর কখন

লোকের সামনে মুখ দেখাতে পারবো না! চিরদিন এই রূপের শক্তিতে আমি সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছি, এতকাল অপ্রতিহত প্রতাপে যে রূপের পূজা পেয়ে এসেছে, আজ তাকে দেখলে লোকে আতঙ্কে ঘৃণায় শিউরে মুখ ফিরিয়ে নেবে, এ চিন্তা অসহ্য!

ভেবেছিলুম, তখনি আত্মহত্যা করে এ ব্যর্থ জীবনের শেষ করে দিই, কিন্তু আমার পূর্ব্বের সেই দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি আবার জেগে উঠ্‌লো! অকারণে আমার উপর যে এত অত্যাচার করলে, সে এই সংসারে বেশ হেসে খেলে বেড়াবে, আর আমি তার সমস্ত অত্যাচার মাথা পেতে নীরবে সহ্য করে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে মরবো, এত শান্ত শিষ্ট প্রকৃতি আমার নয়। আগে এর শোধ নিতে হবে। পরের কথা পরে!

সন্ধান নিলুম, সে কলকাতায় পালিয়েছে! দেশে বিদেশে যেখানেই সে যাক্ আমার প্রতিহিংসা থেকে জগতের কোন শক্তিই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। সেই দিনই মুসলমান মহিলার ব্যবহৃত বোরখায় আত্মগোপন করে কাশী ছেড়ে এখানে চলে এলুম।

কয়দিন সন্ধানের ফলে তাকে বের করেছি, এখন কিছুদিন তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মানুষের কাছে মানুষের সঙ্গ যে কি প্রিয়, যতদিন লোকের সংসর্গে ছিলুম, ততদিন এমন করে বুঝি নি। এই যে অহর্নিশি জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ রহিত করে থাকা—এ যেন প্রাণ কেমন আকুল হয়ে উঠছে। একটু কারুকে কাছে পাওয়া, কিম্বা কথা বলবার জন্য অন্ততঃ একজনমাত্র কারুকে না পেলে মানুষের প্রাণ বেঁচে কি করে।

প্রথম প্রথম তাই দু এক দিন পাশের বাড়ীর একটি বৌয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলুম। মনে করেছিলুম, যখন অত্যন্ত একা মনে হবে, তখন এই জানালা থেকে ছায়ার সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাব, কিন্তু দু এক দিনেই ভুল ভাঙলো!

দেখলুম, জানালার আড়ালে অদৃশ্য থেকে আলাপ করাটা মোটেই সুবিধাজনক নয়, তাতে নিজেরও কোন তৃপ্তি নেই; আর অপর পক্ষের কৌতূহল অত্যন্ত অযথা রকমে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ছায়া আমাদের বাড়ী আসবার জন্য কিম্বা আমায় তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য এমন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো, তখন বাধ্য হয়ে আলাপ করা বন্ধ করতে হলো। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ বন্ধ করার পরও প্রায় দেখতুম, তাদের বাড়ীর আর

একটি লোক সহসা আমার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে!

প্রতি রাত্রির অবসানে ভোরের আলোর সঙ্গে প্রথমেই আমার চোখে পড়ে তার সেই প্রিয়দর্শন তরুণ মুখ! তার পরে সমস্ত দিন সব কাজ কর্ম্মের মধ্যে অবসর পেয়ে যতবারই এ ঘরে আসি, তাকে ওই বারান্দায় কিম্বা ঠিক সামনের ঘরে দেখি। বিকালে রোদের তেজ কমে এলে সে চৌকি পেতে বারান্দায় এসে বসে—সে ছায়ার সঙ্গে গল্প করে, রেণুকে নিয়ে খেলা করে, কিন্তু তার মন যে আমারি ঘরের জানালার পানে সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ হয়ে রয়েছে, সে আমি ঠিক বুঝতে পারি। এ সব বিষয়ে মেয়েদের কখনো ভুল হয় না। কি চায়, কি চায় সে?

যাক্! এতদিনে আমার কাজ শেষ হল! যে জন্য এতদূরে আমার ছুটে আসা—আজ তা সম্পন্ন করেছি!

শেষ মুহূর্ত্তে সে আমায় চিনতে পেরেছিল! এ ভাবে এখানে আমার দেখা পাবে,—সে কখন স্বপ্নেও ভাবে নি! হঠাৎ দেখে বিস্ময়ে আতঙ্কে সে সভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল!

ঠিক সেই সময়েই তাকে মেরেছি! নরকের কুকুর! যখন সে রক্তাক্ত দেহে আমার পায়ের তলায় পড়ে ছট্‌ফট্ করছিল, তখন আমি মনে মনে একটা পৈশাচিক তীব্র

আনন্দ বোধ করছিলুম। মনে হচ্ছিল,—এত সহজে একে মরতে দিলে ঠিক শাস্তি হবে না, উচিত—তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে ওকে টুকরো টুকরো করে কাটা—তাই করতে পারলে আমার মনের আক্ষেপ মিটতো। কিন্তু তা হলে লোক জন এসে পড়তো, গোলযোগ হতো, তাই পিস্তলেই কাজ শেষ করতে হলো!

শাস্তির ভয় আমার নেই, তবে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে শাস্তি পেতে আমি রাজি নই! সে রাত্রিটা কি তীব্র উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যেই কেটেছে!

কিন্তু এখন? যে ভীষণ প্রতিহিংসার আগুন বুকে জ্বেলে তার পিছনে পিছনে অশরীরি ছায়ার মত ছুটছিলুম, যা আমার মনে সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত থেকে আমায় উন্মাদের মত করে রেখেছিল, তার বুকের উত্তপ্ত রক্তে সে আগুন ত আজ নিব্‌লো,—যে একটা অবলম্বন সব সময় জাগরুক থেকে আমায় এ চরম দুর্গতির দিনেও কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, সে ত শেষ হলো,—এখন নিজের কথা ভেবে দেখবার সময় এসেছে, কিন্তু এখন দেখছি কি দারুণ ব্যর্থতায় পূর্ণ আমার এ জীবন! এই বিপুল রিক্ততার দিকে চেয়ে ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে আসছে! আমি ত সংসারের সকলের কাছে মৃত। জগতের সঙ্গে যার সব দেনা পাওনা চুকে গেল,

সে এই জীবন্মৃত অবস্থা নিয়ে আবার এরি মধ্যে কি করে তার বাসা বাঁধবে? সে আমায় একবারে খুন করলে না কেন? জীবনের সকল শোভা সকল সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে এ দুর্ব্বহ জীবন ভার আমি কেমন করে বহন করবো!

রাত্রির তীব্র আনন্দ ও উত্তেজনা দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পেয়েছে! গভীর অবসাদ ও ক্লান্তিতে দেহ মন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে! মৃত্যুই আমার একমাত্র শান্তি এই কথাটা বেশ বোঝা গেল! সংসারে এসে অবধি নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে কুড়ি বৎসর ধরে যে জীবন বহন করে এসেছি, এবার তার অবসান! তার সব সুখ দুঃখ সব হাসি কান্নার শেষ।

শেষ হোক্ তাতে দুঃখ নেই, তবু এক এক বার মনে হয়, আমার এবারকার এই ব্যর্থ জীবনের জন্য দায়ী কে? কে আমার অকলঙ্ক শুভ্র জীবন এমন দুরপনেয় কালিমায় আছন্ন করে দিলে? সর্দ্দার! সর্দ্দার, তুমি যে তখন কোন আশায় আমায় দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলে, তা আমি এখন বুঝেছি! সারা সংসারের বিরুদ্ধে আজ আমার হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে উঠছে; একটা জীবনের প্রতি চারিদিক থেকে এত অত্যাচার! এত অবিচার! শুনেছি—আমি নাকি এই বাংলার এক অভিজাত বংশে জন্মেছি! আজ

আমার এই পরিণাম! আমার জীবন কলঙ্কিত! বিড়ম্বিত আর অবশেষে আজ আমি খুনী আসামী;—ভাবতে গেলে মনে হয়, সর্দ্দারই এ জন্য দায়ী! তার রক্ত দর্শনের জন্য একটা উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা তখন আমায় পাগল করে তোলে!

কিন্তু আমি তার ঋণ শোধ করেছি, আমার জীবনের সার যথা সর্ব্বস্ব দিয়ে—যে দিন যোগেশদাদার সঙ্গে দেখা হল, সেই দিন বুঝলুম, আমি কোন অধঃপতনের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি! এতদিন রূপের গর্ব্বে ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে নিজের চরম দুর্গতির কথা কিছুই বুঝি নি! মানুষ কি করেই এমন আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকে!

ভুল ভাঙতেই ফিরে দাঁড়ালুম! ভেবেছিলুম, কোন একটা সৎকাজে এবারকার জীবন উৎসর্গ করে দেবো! কিন্তু ভাগ্য কি চিরদিনই আমার প্রতি বাম? কোথা থেকে সেই দুরাত্মা অতর্কিতে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করে আমার সব আশা, সব আলো মুহূর্ত্তের মধ্যে নিঁবিয়ে দিলে!

যে দিন তার প্রতিশোধ নিলুম, সেদিন একটা উদ্দাম আনন্দে মন ভরে গিয়েছিল, কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য! সে আমার যে ক্ষতি করেছে, জীবনে কোন দিন কি তা পূর্ণ হবে? যদি তার দশটা প্রাণ থাকতো, আর আমি যদি

অশেষ যাতনা দিয়ে নির্ম্মম হস্তে. তাকে হত্যা করতে পারতুম, তা হলেও কি আমার এ দৈন্স, এ ক্ষতির পূরণ হতো ?

দিন দিন মন যেন কেমন উদাস হয়ে যাচ্ছে! দিন রাত একলা—আর কেবল সেই পুরানো দিনের ছোট বড় সকল ভাবনার মধ্যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অস্পষ্ট কালো ছায়া—মন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আর ত পারা যায় না—কতবার মনে করি, কাশী চলে যাই—সেখানে গিয়ে নিজের সম্বন্ধে যা হোক্ একটা বোঝা পড়া করে ফেলি। তবু যাই যাই করেও যাওয়া হয়ে উঠছে না! এ অন্তরায় কিসের—সে কথা নিজের কাছে স্বীকার করতেও যেন লজ্জা ও কুণ্ঠায় মরে যেতে ইচ্ছা হয়; এত দিন যা কখনো নিজের মনে অনুভব করতে পারি নি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে সেই অপূর্ব্ব ভাবের বন্যায় আমার এ শুষ্ক তৃষিত হৃদয় কূলে কূলে পূর্ণ হয়ে ছাপিয়ে উঠেছে! এ কি অসহনীয় সুখ—এ কি দুঃসহ বেদনা—আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না!

সে নিশিদিন ওই সামনের বারান্দায় বসে কি তৃষিত নেত্রে আমার এই রুদ্ধ জানালার পানে চেয়ে থাকে! আমার এই সঙ্গহীন কর্ম্মহীন অখণ্ড অবসরে আমি তাকে একমনে লক্ষ্য করে তাকিয়ে থাকি, বুঝতে পারি, আমার

সামান্য একটু কিছু শব্দ শোনবার জন্য সে কি উন্মনা, কি উৎকর্ণ হয়ে থাকে!

পুরুষের পূজা পাওয়া আমার জীবনে বিশেষ কিছু নয়; চিরদিন অযাচিত ভাবে সেটা পেয়ে এসেছি, নিজে কোন দিন ত তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করি নি—কিন্তু আজ যেন মনের ভিতর সুঃখে দুখে ভরা কি এক অপূর্ব্ব ভাব জেগে উঠছে! তাকে দেখলে আমার এ কঠোর রুদ্র প্রকৃতি কেন এমন কোমল হয়ে আসে! সারা সংসারের উপর বিজাতীয় ঘৃণা আক্রোশে আমার যে অন্তর জ্বলে জ্বলে উঠছে, তার সন্ধ্যা-তারার মত উজ্জ্বল চোখের স্বপ্নালস দৃষ্টির সামনে সেই বিদ্রোহী মন যেন লজ্জাবতী লতার মত সঙ্কোচে লজ্জায় কেন এমন নত হয়ে পড়ে! আমার চোখের যে দৃষ্টিতে শুধু আগুন ফুটে বিশ্বসংসার দাহ করতে চাইত, সেই জ্বালাময় দৃষ্টি কেন তাকে দেখলে সুখে প্রেমে ব্যথায় এমন কোমল হয়ে আসে! জীবন ও মৃত্যুর সন্ধি ক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ এ কি অমৃতে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠলো!

আমি তোমায় কেবল ব্যথা দিয়েই গেলুম, হে আমার বন্ধু! হে প্রিয়! মন আমার যে কি বলতে চায়, সে আর এ জন্মে বলা হল না! আমায় জানবার জন্য তুমি যে কত আকুল—আমি তা সর্ব্বক্ষণ দেখছি, কিন্তু তোমায়

কিছু জানাতে না পেরে আমার যে কি অন্তর্দ্দাহ—কি নিরাশার তীব্র বেদনা. সে তুমি কিছুই জানলে না !' কি বলে তোমায় জানাব, এই পাঁচীলের আড়ালে থেকে আমার এ হৃদয় তোমার জন্য কি আকুল, কি অধীর হয়ে উঠেছে ! বলবার উপায় নেই, তাই সব কথা অবলাই রইলো, কিন্তু তুমি যে সুধার ধারায় আমার হৃদয় পূর্ণ করে দিলে—এ অন্তিম মুহূর্ত্তে সেই আমার পাথেয়স্বরূপ হয়ে রইলো !

জীবন আমার ব্যর্থ, তা অনেক দিন আগেই জেনেছিলুম, কিন্তু সে যে কতখানি, আর সে যে কত বড় অভিশপ্ত, তা এখন বুঝেছি ! তোমায় দেখে অবধি জীবনের পূর্ণতা যে কি রকমে হতে পারে, তা বুঝলুম ; আর তা না পাওয়ার যে কি তীব্র বেদনা তাও বুঝেছি—এর পরে আর বাঁচা চলে না ।

আমি মরবো ! কিন্তু এখানে নয় ! এখানে মরলে আমার এ কুৎসিত মুখ সকলের চোখে পড়বে—তোমার চোখের ওই মুগ্ধদৃষ্টি—যে আমার স্বরূপ দেখলে ভয় ও ঘৃণায় শিউরে মুখ ফেরাবে—সে আমি সহ্য করতে পারবো না । আমি তা হলে বুক ফেটে মরে যাবো !

এ বাড়ী ছেড়ে এবার যেতে হবে ! যেখানো কোন জন মানবের সমাগম নেই, আমার এত বড় পরাভব দেখার

জন্য যেখানে কোন লোক থাকবে না, সেই রকম স্থানে গিয়ে জীবনের বোঝা নিজের হাতে নামিয়ে বিশ্রাম করবো ! জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার নয়নের ওই মুগ্ধদৃষ্টি আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে জেগে থাকবে—এবারের মত তবে বিদায়—বন্ধু ! বিদায় !

আজ আবার এ কি ব্যাপার ! ঝিয়ের হাতে কে আমায় চিঠি দিয়েছে ! আমার এতদিনের গুপ্ত বাসস্থানটি এবার তা হলে বাইরের লোকের সন্ধানে পড়েছে—আর নয়—এবার এখান থেকে নিতান্তই মরতে হলো !

চিঠি দিয়েছে এক এটর্ণী—আমার পিতামহ না কি তাঁর সমস্ত বিষয় আমাকেই দান করে গেছেন—তাঁর মৃত্যুর পর ডিটেকটিভ লাগিয়ে এতদিনে আমার সন্ধান পেয়েছেন—বুধবারে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তিনি আরও লিখেছেন—আমার বর্ত্তমান অবস্থা তিনি সবই জানেন—তার জন্য কোন চিন্তা নেই—সে বিষয়ে তিনিই সব ভার নেবেন।

চিঠি পড়ে আমার হাসি আসছে! তিনি আমায় আশ্বাস দিয়েছেন—কিন্তু সে আশ্বাসে আমার কি লাভ ! আমি জীবনে কোন লোকের কাছে মুখ খুলতে পারবো না, তা যদি পারতুম, তবে নিজেই আদালতে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে

বলতুম, আমি অত্যাচারের শোধ নিয়েছি। বুধবারের আগেই আমায় মরতে হবে। আর বিষয়? সে যদি আমি বেঁচে থেকে রাস্তায় ভিক্ষা করেও খেতুম—তবু বাঁ পা দিয়েও স্পর্শ করতুম না। যে দাম্ভিক বৃদ্ধ, আমার বাবার আমার ছোট ভাইয়ের, আমার মায়ের অকালমৃত্যুর মূল কারণ, তার সেই অভিশপ্ত বিষয় আমি ভোগ করবো? আমি কি কোন দিন ভুলতে পারবো—কি কষ্টে—কি যন্ত্রণায় বিনা চিকিৎসায় তাঁদের প্রাণ গেছে!

সব শেষে—মা যখন মৃত্যুশয্যায়—তখনো শুধু আমার জন্য কত মিনতি করে বার বার মা তাঁকে চিঠি দিয়েছেন! আমার বেশ মনে আছে—প্রত্যুত্তরের শেষ আশায় প্রাণ যেন তাঁর রাস্তার দিকে পড়ে থাকতো! আমার এই রকম পরিণাম হবে, তাই জেনেই কি তিনি অত অস্থির হয়েছিলেন?

আজ আমায় সব বিষয় দিয়েছেন, কিন্তু আর আমার কিছুতেই প্রয়োজন নেই। সেদিন যদি মুষ্টিভিক্ষা দিয়েও আমায় বাঁচাতেন, তা হলে আজ আমার এ দশা হত না। তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। প্রার্থনা করি, যদি মৃত্যুর পরে আত্মা বলে কিছু থাকে, তবে যেন অনন্ত অনন্ত কাল ধরে তাঁকে নরকের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে হয়!

যোগেশ দাদা! আজ তুমি কোথায়? হয় ত তুমি

আমারি সন্ধানে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আমার যদি মুখ দেখাবার উপায় থাকতো, তা হলে তোমায় আমি খবর দিতুম। আমি জানি, খবর পেলে তুমি তখনি ছুটে আসবে। কিন্তু আমি যে আর তোমার কাছেও মুখ দেখাতে পারবো না। তোমার মত আর সকলে যাকে দেখলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিত, তুমি তাকে পথের ধূলো থেকে তুলে নিয়ে তোমার উদার স্নেহের আশ্রয় দিয়েছিলে, জীবন যে কি, ইচ্ছে করলে যে এই জীবনকে কত উচ্চে তুলতে পারা যায়, সে তুমিই আমায় শিখিয়েছিলে। আমি অভাগিনী—অত সুখ আমার ভাগ্যে সইলো না—তা ছাড়া আজ যে জ্বালায়, নিরাশায় আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে, সে তোমার অগাধ স্নেহ-ধারায়ও জুড়বে না। তাই আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। এই ধূলো মাটির পৃথিবীতে তুমি দেবতা! তুমি যেখানেই থাক—আমার এই শেষ দিনে আমি তোমায় প্রণাম করছি!

যিনি আমায় চিঠি লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে না। তাঁর আসবার আগেই আমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। আমার যা কিছু বলবার ছিল, সব এই খাতায় লিখে রেখে গেলুম। আমার দুর্ভাগ্য জীবনের ইতিহাস সবই এই লেখা থেকে তিনি জানতে পারবেন। ইতি—মায়া

বিনয়কুমারের পাঠ শেষ হইল। কক্ষস্থ চারিজনে কিছুক্ষণ নির্ব্বাকভাবে বসিয়া রহিলেন। সকলের অন্তর এই শোচনীয় কাহিনীর চিন্তায় কাতর। মনে হইতেছিল—যেন কোন অশরীরি অতৃপ্ত ছায়া সেই কক্ষের মধ্যে কাঁদিয়া ফিরিতেছে!

গৃহের আলো দুই একবার উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন—প্রভাত হইয়াছে।

বিনয়কুমার বলিলেন—এর জীবনের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে,—সহসা সেটা কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় না। এমন ঘটনা গল্প উপন্যাসেও দুর্লভ। সত্যই একে আজীবন ধরে ভাগ্যের সঙ্গে কি নিদারুণ যুদ্ধ করতেই হয়েছে!

প্রমথ বাবু নতজানু হইয়া সেই লাঞ্ছিতার ললাট চুম্বন করিলেন—তাঁর নয়নের অশ্রু বড় বড় ফোঁটায় তাহার বিকৃত ললাটের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

জগতে যে দুইজন তাহাকে একান্তভাবে ভালবাসিয়া-ছিল—তাহারা প্রভাতের প্রথম অরুণালোকে অশ্রুবাষ্পের ভিতর দিয়া ব্যথাভরা দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সমাপ্ত

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই। আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব প্রকাশিতগুলি একত্র, বা পত্র লিখিয়া, সুবিধানুযায়ী, পৃথক্ পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধিত হওয়ায়, গ্রাহকদিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ⁄১০ লাগিবে। অ-গ্রাহকদিগের ⁄৴০ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, "গ্রাহক-নম্বর" সহ পত্র দিতে হইবে।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;—

১। অভাগী (৬ষ্ঠ সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

২। ধর্ম্মপাল (৩য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

৩। পল্লীসমাজ (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪। কাঞ্চনমালা (২য় সং)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ।

৫। বিবাহ-বিপ্লব (২য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।

৬। চিত্রালী (২য় সং)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ।

৭। দুর্ব্বাদল (২য় সং)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

৮। শাশ্বত ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

৯। বড়বাড়ী (৫ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

১০। অরক্ষণীয়া (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১। ময়ূখ (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সং)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

১৩। রূপের বালাই (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫। লাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।

১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

২০। ঘালিদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি-এ।

২৩। দুঃখের ঘর (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।

২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

২৭ ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

২৯। নব-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ।

৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।

৩১। নীল মাণিক—রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট।

৩২। হিসাবনিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।

৩৩। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৩৪। ইংরেজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়. এম-এ

৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার—(২য় সংস্করণ) শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই।

৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী (৩য় সংস্করণ) রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।

৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম-এ।

৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৪৩। ভবানী—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪৫। অপরিচিতা (২য় সং)—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বসুমতী-সম্পাদক।

৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল।

৪৮। ছবি (২য় সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪৯। মনোরমা—শ্রীমতী সরসীবালা দেবী।

৫০। সুরেশের শিক্ষা (২য় সং)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ।

৫১। নাচওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৫২। প্রেমের কণ্ঠা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

৫৩। গৃহহারা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৪। দেওয়ানজী—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

৫৫। কাঙ্গালের ঠাকুর(২য় সং)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

৫৬। গৃহদেবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

৫৭। হৈমবতী—৺চন্দ্রশেখর কর।

৫৮। বোঝাপড়া—শ্রীনরেন্দ্র দেব।

৫৯। বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

৬০। হারান ধন—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।

৬১। গৃহ-কল্যাণী—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

৬২। সুরের হাওয়া—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, বি-এস্ সি।

৬৩। প্রতিভা—শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত।

৬৪। আত্রেয়ী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, বি-এল।

৬৫। লেডী ডাক্তার—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।

৬৬। পাখীর কথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ।

৬৭। চতুশ্চেদ (সচিত্র)—শ্রীভিক্ষু সুদর্শন।

৬৮। মাতৃহীন—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

৬৯। মহাশ্বেতা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৭০। উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান—শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

৭১। প্রতীক্ষা—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এল।

৭২। জীবন সঙ্গিনী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৭৩। দেশের ডাক—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭৪। বাজীকর—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

৭৫। স্বয়ম্বরা—শ্রীবিধুভূষণ বসু।

৭৬। আকাশ কুসুম—শ্রীনিশিকান্ত সেন।

৭৭। বরপণ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

৭৮। আহুতি—শ্রীমতী সরসীবালা বসু।

৭৯। অন্ধা—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

৮০। মণ্টুর মা—শ্রীচরণদাস ঘোষ।

৮১। পুষ্পদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

৮২। রক্তের ঋণ—শ্রীনরেশচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল।

৮৩। ছোড়্‌দি—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

৮৪। কালো বৌ—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি।

৮৫। মোহিনী—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ।

৮৬। অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

৮৭। দিল্লীশ্বরী (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮৮। সুরের মায়া—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮৯। আনন্দ-মন্দির—শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা